নবীন বিজ্ঞানী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত
জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক

সেপ্টেম্বর, ২০১৮

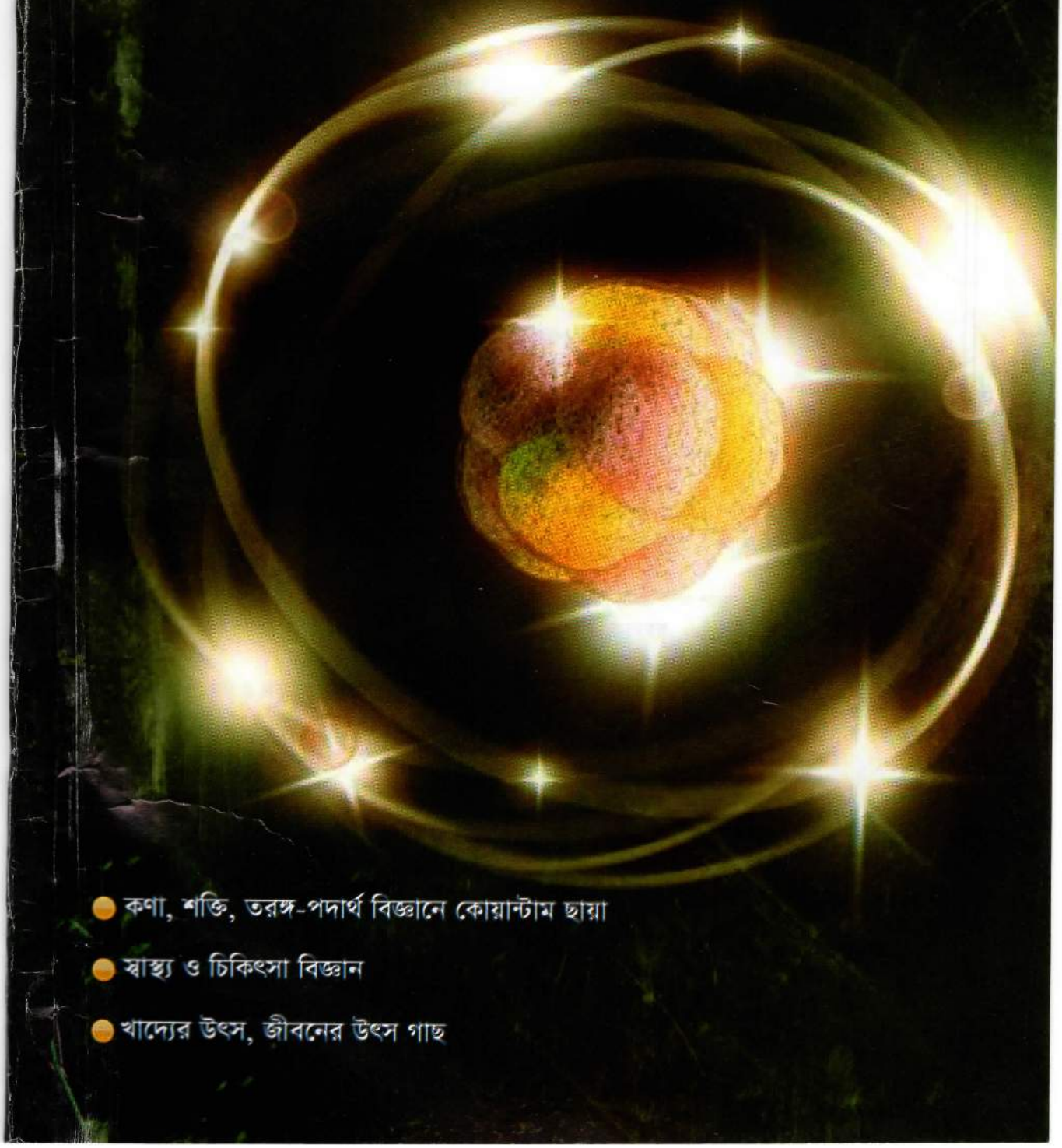

- কণা, শক্তি, তরঙ্গ-পদার্থ বিজ্ঞানে কোয়ান্টাম ছায়া
- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান
- খাদ্যের উৎস, জীবনের উৎস গাছ

নবীন বিজ্ঞানী

জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী

সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সংখ্যা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি :
জনাব স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক

সম্পাদক :
জনাব সুকল্যাণ বাছাড়
কিউরেটর
জনাব নিশাত বেগম
কিউরেটর
জনাব মো: কামরুল ইসলাম
লাইব্রেরিয়ান
জনাব মুমিনুর রশীদ
সহকারী কিউরেটর
জনাব মো: মোমিত হাসান
সহকারী কিউরেটর

প্রচ্ছদ :
জনাব রবিন বসাক আর্টিস্ট

অঙ্গসজ্জা/মুদ্রণালয় :
তিশা এন্টারপ্রাইজ
৩২ নারিন্দা রোড, নারিন্দা
ঢাকা-১১০০।

প্রকাশনায় :
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা :
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৯১১২০৮৪
ই-মেইল: dgnmst@gmail.com
www.nmst.gov.bd

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৮

সূচিপত্র

- কণা, শক্তি, তরঙ্গ-পদার্থবিজ্ঞানে কোয়ান্টম ছায়া ভূবন ১
  – ড. সালেহ হাসান নকীব
- তারারা আমাদের বন্ধু ৬
  – সৌমেন সাহা
- প্রতিকূল আবহাওয়ায় ও মাটি বিহীন পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের প্রযুক্তি ও সম্ভবনা ২৩
  – কৃষিবিদ ড. মোঃ শরফ উদ্দিন
- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ২৬
  – প্রকৌশলী মোঃ টিপু সুলতান
- টিউমার নিরাময়যোগ্য ব্যাধী ২৯
  – ডা. এস.কে.এম. রফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী
- খাদ্যের উৎস, জীবনের উৎস গাছ ৩১
  – কৃষিবিদ আলী আকবর
- বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন ও নিরাপদ খাদ্য ৩৫
  – শহিদুল ইসলাম
- মহাসাগরে বোতলের মাধ্যমে বার্তা পাঠানোর রোমাঞ্চকর ইতিহাস ৪১
  – নিশাত বেগম

"নবীন বিজ্ঞানী" এর নিয়মাবলী

লেখক-লেখিকাদের জন্য

- রচনা বিজ্ঞানের যেকোনো বিষয়ে হতে পারে, তবে তা যেমন নবীনদের জন্য উপযোগী হতে হবে তেমনি তার ভাষা সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখে বা টাইপ করে সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে।
- অনির্বাচিত লেখা ফেরৎ দেয়া হবে না।
- রচনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে।
- রচনা মোটামুটি দুই থেকে তিন হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- রচনার সাথে ছবি দিতে হলে সেসব ছবি লেখককেই সরবরাহ করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি হলে পৃথক কাগজে সেটি সুন্দরভাবে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে।
- ভুল তথ্য ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নয়।

প্রকাশিত রচনার জন্য লেখককে সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

সম্পাদক
"নবীন বিজ্ঞানী"
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২০৮৪
E-mail : infonmst@gmail.com, dg@nmst.gov.bd
facebook : www.facebook.com/nmstbdpg/

নবীন বিজ্ঞানী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় সম্পাদক-এর সাথে যোগাযোগ করুন।

মুখবন্ধ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার মিলন কেন্দ্র। অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এ প্রতিষ্ঠান নিয়মিত ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী "নবীন বিজ্ঞান" প্রকাশ করছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ত্রৈমাসিক "নবীন বিজ্ঞান" প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য হলো মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ঘটানো এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। এই প্রকাশনায় ৮টি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশনার প্রবন্ধ গুলো বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আশা করি। জনসাধারণকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার। অঙ্গীকার রূপায়নের একটি হাতিয়ার হলো "নবীন বিজ্ঞানী" প্রকাশনা। যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় আমাদের এই প্রকাশনা একটি অবয়ব পেয়েছে তাদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় প্রকাশনাটি একটি মানসম্মত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এ প্রত্যাশা করি। ভবিষ্যতে প্রকাশনার জন্য আরোও বেশি বেশি লেখা পাঠিয়ে আমাদের কৃতার্থ করবেন এ আশা পোষণ করছি।

(স্বপন কুমার রায়)
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

কণা, শক্তি, তরঙ্গ-পদার্থবিজ্ঞানে কোয়ান্টাম ছায়া-ভুবন

ড. সালেহ হাসান নকীব

দৃশ্যমান মহাবিশ্বের বয়স প্রায় ১৪ বিলিয়ন বছরের কাছাকাছি। পদার্থবিজ্ঞানীরা এই মহাবিশ্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বারংবার কণা, শক্তি অথবা তরঙ্গ, এই শব্দগুলোর আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কণা বলতে সাধারণত আমরা এখন ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনের মত কণিকাদের কথা বুঝে থাকি। যারা বিজ্ঞানে একটু আগ্রহী তারা হয়ত কোয়ার্ক, মেসন, হিগস বোসন, ফোটন ইত্যাদির নামে শুনে থাকবেন। এই কণাগুলোকে তাদের বৈশিষ্ট অনুযায়ী অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা যায়। কণাগুলো কিন্তু সবাই মৌলিকও নয়। এদের অনেকেরই আভ্যন্তরীণ গঠন আছে। কোন কোনটা আবার অস্থায়ী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এরা অন্য কণায় রূপান্তরিত হয়। কণাগুলোর আচরণ কেমন হবে তা বুঝতে হলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু কণা বলতে আমরা কী বুঝি? এই আপাত সরল প্রশ্নটি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিরিখে আর সহজ থাকে না।

আমাদের ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে। আর এই অভিজ্ঞতার ভৌত বর্ণনা করার জন্য অধিকাংশ সময়ই নিউটনীয় বলবিদ্যা যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হয়। বিজ্ঞানী ল্যাগ্রাঞ্জ, ডি-এলেমবার্ট, হ্যামিল্টন প্রমুখের অবদানে নিউটনীয় বলবিদ্যা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর সাথে আছে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচৌম্বক ক্ষেত্র সমীকরণ। দুয়ে মিলে চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান। এই চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান আমাদের প্রত্যাহিক জীবনের ভৌত অভিজ্ঞতার সাথে চমৎকার সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পদার্থবিজ্ঞান এক মহাসংকটে পড়ে যায়। অনেকগুলো নতুন ঘটনাবলী পদার্থবিদদের দারুণ সমস্যায় ফেলে দেয়। যেমন, উত্তেজিত পরমাণু থেকে বিচ্ছিন্ন রেখা বর্ণালীর (Line spectrum) নিঃসরণ, কৃষ্ণবস্তু থেকে তাপীয় বিকিরণের শক্তি ঘনত্ব এবং তার সাথে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সম্পর্ক, আলোক-ইলেকট্রন নিঃসরণ (Photo-electron emission)। এই সব ঘটনা চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দেয়। বিজ্ঞানীরা দেখতে পান কৃষ্ণ-বস্তু থেকে তাপীয় বিকিরণের শক্তি-বর্ণালী (Energy spectrum) জানা পদার্থবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারছে না। তারা আরো দেখতে পান উত্তেজিত পরমাণু থেকে নিঃসরিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট মান গ্রহন করে। নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো পাওয়া যায় না। অথচ চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো পাওয়া যাবে বলেই ধারণা করে। আলোক-ইলেকট্রন নিঃসরণের হার মনে করা হত আলোর প্রাবল্যের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের নিচের আলো যত প্রবলই হোক না কেন, ইলেকট্রন নিঃসরণ্ ঘটাতে পারে না। পদার্থবিদরা বুঝতে পারেন বিদ্যমান ধ্যানধারণায় মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক আর নীলস্ বোরের হাত ধরে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান এই সংকটে পথ দেখাতে শুরু করে। প্রায় একই সময় অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এছাড়াও একই বছর (১৯০৫) আইনস্টাইন আলোক কোয়ান্টামের ধারণা ব্যবহার করে ধাতব বস্তুর পৃষ্ঠ থেকে আলোক সম্পাতের ফলে সৃষ্ট ইলেকট্রন নিঃসরণের ঘটনার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দাঁড় করান। এটি ছিল প্ল্যাঙ্কের বিকরণ কোয়ান্টাম ধারনার একটি সফল প্রয়োগ। পরবর্তীতে আইনস্টাইন এই আবিস্কারের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯২১ সালে। এর তিন বছর আগেই, ১৯১৮ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। সময়টি ছিল পদার্থবিজ্ঞান জগতে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর আর উত্তেজনাপূর্ণ। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন একটি সময়কালের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে।

চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানে কণা, শক্তি ও তরঙ্গের খুব সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। কণার আছে নির্দিষ্ট অবস্থান, আকার, আকৃতি এবং ভর। শক্তি হচ্ছে এমন কিছু যা দিয়ে কাজ করা যায়। তরঙ্গ হচ্ছে পর্যাবৃত্ত গতির সাথে সম্পর্কিত এক ধরণের কম্পন, আন্দোলন বা দোলন যা বিশেষায়িত হয় তার বিস্তার, তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কের দ্বারা। কণাকে একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থানে ধরে রাখা যায়, আর তরঙ্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া, কোন কিছুর ওঠা নামা, পরিবর্তন।

শক্তির ব্যাপারটা, বিশেষ করে তাপ শক্তির প্রকৃতি অবশ্য অনেক দিন বিজ্ঞানীদের কাছে অস্পষ্ট ছিল। প্রায় দু'শো বছর আগে তাপগতিবিদ্যার উদ্ভব ও তার ক্রমবিকাশ শক্তির স্বরূপ একটু একটু করে আমাদের সামনে উন্মোচিত করে। কণা এবং তরঙ্গ উভয়েই শক্তি বহন করতে পারে (ছুঁড়ে দেয়া ঢিলে স্থিতি ও গতিশক্তি দুটোই থাকতে পারে, তেমনি সাগর তটে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মধ্যেও আছে স্থিতি এবং গতিশক্তি) এবং শক্তি প্রয়োগের ফলে কণা ও তরঙ্গ উভয়ের ভৌত অবস্থায় পরিবর্তন সাধন করা যায়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব ভর এবং শক্তির মধ্যে একটি সমতুল্যতার কথা বলে। $E=mc^2$, সমীকরণটি বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে পরিচিত সমীকরণ। এই সমীকরণে E হচ্ছে শক্তি, m হচ্ছে ভর এবং c হচ্ছে শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ।

উনিশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান আপাত সুপ্রতিষ্ঠিত এই সব ধ্যান ধারণা নিয়ে ভালোই ছিল। বিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করতেন পদার্থবিজ্ঞানে জানার আর তেমন বাকি কিছু নেই। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার উদ্ভব এই ধারণা একেবারে ধূলিসাৎ করে দেয়। বিজ্ঞানীরা প্রবল বিস্ময়ে আবিষ্কার করতে শুরু করলেন কোয়ান্টাম জগতে আমাদের বহুদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণাগুলোর অনেক কিছুই আর খাটে না। কণা, শক্তি, তরঙ্গ সম্পর্কে আমাদের যে আত্মবিশ্বাস তাতে ফাটল দেখা দেয়। কোয়ান্টাম ফিজিক্স কণা-তরঙ্গ দ্বৈততার (Wave-particle duality) কথা বলে। সেখানে আছে অনতিক্রম্য এক অনিশ্চয়তার কথা। শক্তির প্রকৃত বাহক তাহলে কে? কোয়ান্টাম জগতে 'কণা' কখনো 'তরঙ্গের' মত। আবার কখনো 'তরঙ্গ' বলে যাদের বুঝে এসেছি তারা যেন ক্ষেত্র বিশেষে 'কণার' মত। কোয়ান্টাম জগৎ যেন এক ছায়াজগৎ, যেখানে রূপান্তর এবং সতত পরিবর্তনই মুখ্য, 'আসল' চেহারা নিয়ে কেউ যেন ধরা দিতে চায় না। এই কোয়ান্টাম ছায়াজগতে 'কণা' আর 'তরঙ্গ' বলতে আসলে কী বোঝায় সেটিই হচ্ছে আমাদের আজকের লেখার বিষয়।

আমরা কৃষ্ণবস্তু থেকে তাপীয় বিকিরণ দিয়ে শুরু করতে পারি। পদার্থবিজ্ঞানে কৃষ্ণবস্তু হচ্ছে এমন এক বস্তু যা সব ধরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা কম্পাঙ্কের আলো শোষণ ও বিকিরণ করতে পারে। আদর্শ কৃষ্ণবস্তু একটি কেতাবি ধারণা তবে প্রকৃতিতে অনেক জিনিসই আছে যা আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর কাছাকাছি। যেমন সূর্য। বলে রাখা ভালো, আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং কম্পাঙ্ক একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। এই দুই রাশির গুণফল হচ্ছে আলোর বেগ। এই সম্পর্ক শুধু আলোক তরঙ্গের জন্য নয়, সব ধরণের তরঙ্গ গতির জন্যই প্রযোজ্য। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে আসছেন, আলো হচ্ছে এক ধরণের তরঙ্গ। এই বিশ্বাসের পেছনে শক্ত কারণও আছে। আলোর ব্যতিচার (Interference), অপবর্তন (Diffraction), সমাবর্তন (Polarization) ইত্যাদি ঘটনার প্রত্যেকটি তরঙ্গ তত্ত্ব দিয়ে চমৎকার ব্যাখ্যা করা যায়। বিশেষ করে কোন পর্দায় তৈরি হওয়া আলোর ব্যতিচার ঝালর (Interference fringe) আর দু'দিক থেকে মিলিত হওয়া পানির ঢেউয়ের উপরিপাতনের (Superposition) ফলে সৃষ্ট প্যাটার্নের মধ্যেকার সাদৃশ্য কোন বিজ্ঞানীর চোখ এড়িয়ে যাওয়ার মত নয়। তো, এই যেখানে পটভূমি, সেখানে কৃষ্ণবস্তু থেকে বিকিরিত শক্তির জন্য তত্ত্ব তৈরিতে বিজ্ঞানীরা যে তরঙ্গ মডেল ব্যবহার করবেন তাতে আর সন্দেহ কী? বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন একটি উত্তপ্ত কৃষ্ণবস্তু থেকে নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ আকারে শক্তির নিঃসরণ হবে। বাহ্যত এই ধারণা অত্যন্ত

যৌক্তিক বলেই মনে হওয়ার কথা। আমরা প্রকৃতিতে যেখানেই তরঙ্গ দেখেছি সেখানেই তার একটি নিরবচ্ছিন্ন চেহারা আমাদের চোখে পড়ে। তরঙ্গ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি পরিবিহন করে। অন্য দিকে বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে কণার ধর্ম। কিন্তু এই নিরবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ মডেল এক মহা সমস্যার সৃষ্টি করল। বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন নিরবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ মডেল সত্য হলে যেকোনো সসীম তাপমাত্রায় কৃষ্ণবস্তু হতে সর্বমোট বিকিরিত শক্তি অসীম হয়ে দাঁড়ায়! তাপমাত্রার মান যাই হোক না কেন! বাস্তবে যা কখনোই হয় না। বাস্তবে এমন ঘটনা ঘটলে যেকোনো কৃষ্ণবস্তু থেকে বিকিরিত শক্তি সব কিছু ছারখার করে দিত। বিজ্ঞানীরা এই তাত্ত্বিক মহা সমস্যার নাম দিলেন-Ultraviolet Catastrophe, বাংলায় আমরা বলতে পারি, অতিবেগুনী বিপর্যয়। সমাধান কি? একটি বিশাল প্রশ্ন পদার্থবিদদের অস্থির করে তোলে। জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলেন। তিনি দেখলেন বিকিরিত শক্তিকে যদি নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ না ধরে একেকটি বিচ্ছিন্ন শক্তির 'প্যাকেট' হিসেবে বিবেচনা করা যায় তবে পরীক্ষালব্ধ কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ বর্ণালীর সাথে তত্ত্ব দারুণভাবে মিলে যায়। প্যাকেট আকারে শক্তি বিকিরিত হলে সসীম তাপমাত্রায় অতিবেগুনী বিপর্যয় ঘটতে পারে না। কিন্তু এই অনুমিত প্যাকেটটা আসলে কেমন প্যাকেট? প্ল্যাঙ্ক ধরে নিলেন বিকিরিত শক্তি কেবলমাত্র কিছু নির্দিষ্ট মান ধারণ করতে পারে। যেমন, বিকিরণের কম্পাঙ্ক f হলে, শক্তি $E = nhf$ এখানে h হচ্ছে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। এই নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের জন্য একটি কৃষ্ণবস্তু হতে শুধুমাত্র hf, 2hf, 3hf, 4hf....nhf (n একটি পূর্ণ সংখ্যা) মানের শক্তি বিকিরিত হতে পারবে। hf-এর একটি অপূর্ণাঙ্গ গুণিতক (যেমন 1.5hf বা 3.76hf), এমন শক্তির বিকিরণ সম্ভব নয়। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, f কম্পাঙ্কের জন্য একটি প্যাকেটে শক্তি আছে nhf কৃষ্ণবস্তু থেকে এক প্যাকেট শক্তি বিকিরিত হতে পারে, দুই প্যাকেট, তিন প্যাকেট, ইত্যাদি, কিন্তু কখনোই দেড় প্যাকেট বা সোয়া পাঁচ প্যাকেট নয়। এই পূর্ণ সংখ্যায় বিকিরণ শর্ত, নিরবিচ্ছিন্ন শক্তি বিকিরণের ধারণা থেকে একেবারে আলাদা। এই যে প্যাকেট আকারে শক্তির বিকিরণ, একে শক্তির কোয়ান্টায়ন (Quantization of energy) বলা হয়ে থাকে। আলোক শক্তির এই বিচ্ছিন্ন প্যাকেটগুলো হচ্ছে একেকটি ফোটন (Photon)। ফোটন কণার মত আচরণ করে।

শুরুতে প্ল্যাঙ্ক শুধুমাত্র বিকিরিত শক্তির কোয়ান্টায়নের ধারণা সামনে নিয়ে আসে না। পরবর্তীতে শোষিত এবং বিকিরিত উভয়ের জন্যই শক্তির কোয়ান্টায়নের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। আলোক-ইলেকট্রন নিঃসরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন দেখান আলো যে শুধু কণা রূপে শোষিত বা বিকিরিত হয় তাই নয়, আলো প্রবাহিতও হয় এই কণা চেহারাটি অক্ষুন্ন রেখেই। আলোক-ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্য আইনস্টাইনের দেয়া তত্ত্বটি অনেকটা এই রকম-প্যাকেট আকারে প্রবাহিত একটি আলোক কণা, ফোটন, যখন একটি ধাতব বস্তুর মুক্ততলে আপতিত হয় তখন ধাতব পৃষ্ঠের একটি ইলেকট্রন ফোটনের শক্তিটুকু গ্রহণ করতে পারে। গৃহীত শক্তি যথেষ্ট হলে ইলেকট্রনটি ধাতু থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। এই ঘটনাই হচ্ছে আলোক-ইলেকট্রন নিঃসরণ। বিজ্ঞানীদের যে বিষয়টি প্রথম থেকেই ধাঁধায় ফেলেছিল তার একটি চমৎকার সমাধান এই বর্ণনার ভেতর লুকিয়ে আছে। প্রত্যেক ধাতুর তার ভেতরকার পরিবহণ (Conduction) ইলেকট্রন ধরে রাখার একটি সামর্থ্য আছে। একটি নির্দিষ্ট মানের শক্তি প্রয়োগ না করা হলে এই পরিবহণ ইলেকট্রনগুলোকে ধাতু থেকে বাইরে বের করে আনা যায় না এই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর জন্য ভিন্ন। এই শক্তিকে বলা হয় ধাতুটির কর্ম-অপেক্ষক (Work-function)। একটু আগেই আমরা জেনেছি ফোটনের শক্তি হচ্ছে nhf এই শক্তি নিয়েই ফোটন ধাতব পৃষ্ঠে আপতিত হয়। যদি কম্পাঙ্ক যথেষ্ট না হয় (অর্থাৎ কর্ম-অপেক্ষকের সমতুল শক্তির জন্য যা প্রয়াজন তার তুলনায় ছোট হয়) তাহলে আলোর প্রাবল্য (ফোটনের সংখ্যা) বাড়িয়ে কোন

ইলেকট্রন ধাতু থেকে মুক্ত করা যাবে না। ফোটনের শক্তি যেহেতু কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক তাই আরো বেশি কম্পাঙ্কের ফোটনের প্রয়োজন হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আলোক-ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্য ফোটনের কম্পাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ, প্রবাল্য (ফোটনের সংখ্যা) গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই যে শক্তির কোয়ান্টায়ন, আলোক তরঙ্গের শক্তি প্যাকেটের (ফোটন) মত আচরণ এর ভেতর গভীর আরেকটি তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। এই তাৎপর্য সর্ব প্রথম উপলব্ধি করেন পদার্থবিদ নীলস্ বোর। বোর ভাবলেন, কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ আর আলোক-ইলেকট্রন নিঃসরণে যদি শক্তির কোয়ান্টায়নের মত ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে উত্তেজিত পরমাণুর বেলায় নয় কেন? এটাই বোরের যুগান্তকারী ধারণা। বোর বললেন, পরমাণুর ভেতর যে ইলেকট্রনগুলো থাকে, তাদের শক্তি নিরবচ্ছিন্ন নয়। ইলেকট্রনগুলো প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র কিছু বিচ্ছিন্ন শক্তি-স্তরে থাকতে পারে। এটাকে বলা যায় পরমাণুতে ইলেকট্রনের শক্তি-স্তরের কোয়ান্টায়ন (Quantization of Electronic Energy levels in atoms)। এই ধারণা উত্তেজিত পরমাণু থেকে পাওয়া রেখা বর্ণালী সমস্যার একটি অত্যন্ত চমৎকার ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। বোর বললেন, উত্তেজিত পরমাণু থেকে কেবল মাত্র তখনই শক্তি নিঃসরিত হয় যখন ইলেকট্রন একটি উচ্চ শক্তি-স্তর থেকে নিম্ন শক্তি-স্তরে নেমে আসে। নিঃসরিত ফোটনের বর্ণালী (কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য) নির্ভর করে এই দুই স্তরের মধ্যে শক্তি পার্থক্যের উপর। যেহেতু শক্তি-স্তরগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন, উত্তেজিত পরমাণু থেকে নিঃসৃত বর্ণালীও হবে বিচ্ছিন্ন। নিরবচ্ছিন্ন আলো নয়, বরং রেখা বর্ণালী (চিত্র-১)। বোরের এই ধারণার গাণিতিক রূপ অত্যন্ত সহজ। ধরা যাক, উচ্চ শক্তি-স্তরটিতে ইলেকট্রনের শক্তি E2, নিম্ন শক্তি-স্তর ইলেকট্রনের শক্তি E1, তাহলে বোরের ধারণা অনুযায়ী $(E2 - E1) = nhf$ এখানে f হচ্ছে নিঃসরিত রেখা বর্ণালীর কম্পাঙ্ক। এই পরমাণু মডেলের জন্য নীলস্ বোর নোবেল পুরস্কার পান ১৯২২ সালে।

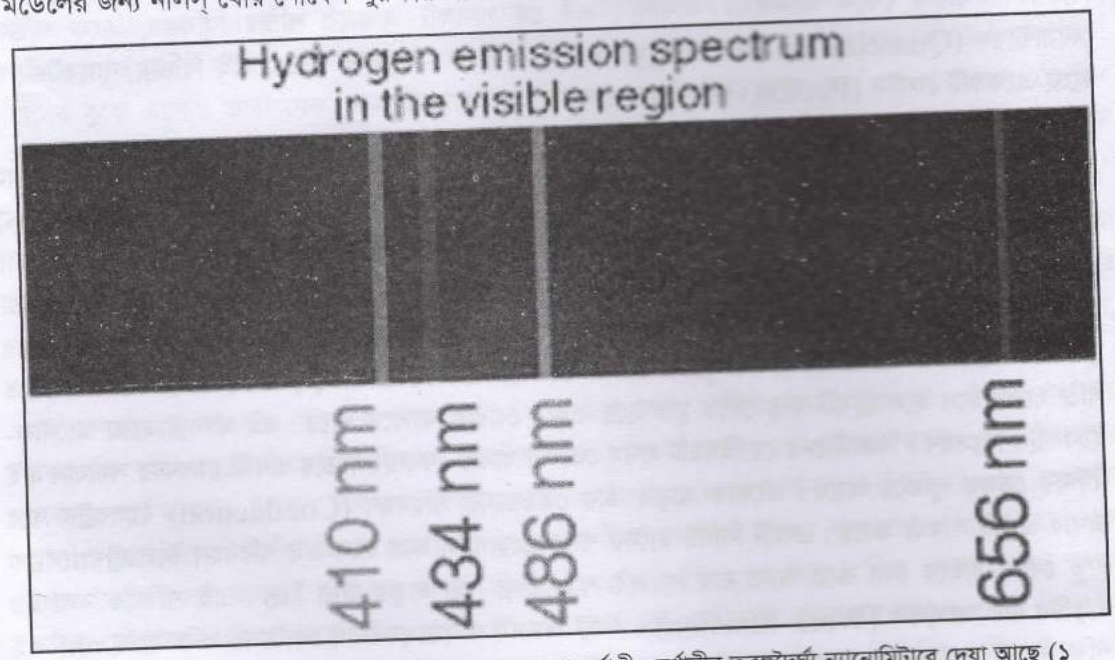

চিত্র-১ হাইড্রোজেন অ্যাটম থেকে নিঃসরিত দৃশ্যমান রেখা-বর্ণালী। বর্ণালীর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ন্যানোমিটারে দেয়া আছে (১ ন্যানোমিটার = $১০^{-৯}$ মিটার)। ছবিটি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে শক্তির কোয়ান্টায়ন এবং শক্তি-স্তরের কোয়ান্টায়ন কৃষ্ণবস্তু থেকে তাপীয় বিকিরণ, আলোক-ইলেকট্রন নিঃসরণ এবং উত্তেজিত পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসা রেখা বর্ণালীর অত্যন্ত সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে গিয়ে আলোর নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ ধারণাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে। আলো এখন বিচ্ছিন্ন শক্তির প্যাকেট, ফোটন কণা।

প্রশ্ন ওঠা সঙ্গত, তাহলে আলোর যে ব্যতিচার, অপবর্তন এবং সমাবর্তন আমরা দেখতে পাই তার ব্যাখ্যা কি দাঁড়াবে? এই সমস্ত ঘটনা আলোর তরঙ্গ ধর্মকেই নির্দেশ করে। আলো যদি কণাই হবে তাহলে এই সব ঘটনার ব্যাখ্যা কি? আসলে ব্যাখ্যা অনেক স্তরে দেওয়া যায়। সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে, কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান তরঙ্গ-কণা দ্বৈততার উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন একটি ঘটনা তার তরঙ্গ না কণা ধর্ম প্রকাশ করবে তা নির্ভর করে ঘটনাটি কি ভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে তার উপর। যেমন, আলোক-ইলেকট্রন নিঃসরণ পরীক্ষণে (Photo Electron emission Experiment) আলো তার কণা ধর্ম প্রকাশ করে। তেমনি দুটো উৎস থেকে আলো যখন একটি পর্দায় একত্রিত হয় তখন যে ব্যতিচার ঝালর আমরা দেখতে পাই তা আলোর তরঙ্গ ধর্মের বহিঃপ্রকাশ। বিষয়টি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভৌত অভিজ্ঞতার সাথে ঠিক যায় না। এই সব অভিজ্ঞতায় এ ধরণের দ্বৈততা দেখা যায় না। কিন্তু শুরুতেই বলেছিলাম কোয়ান্টাম জগত হচ্ছে এক আলো-ছায়ার জগৎ। অনেক দিক থেকেই কোয়ান্টাম ঘটনাবলী আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাইরে।

এতক্ষণ আমরা 'তরঙ্গের' 'কণা' ধর্ম নিয়ে কথা বলেছি। দেখেছি নিরবচ্ছিন্ন 'তরঙ্গ' বলে যাকে জেনে এসেছি তা সব সময় তরঙ্গ নয়। কখনো কখনো 'কণা'। আমরা যাদের 'কণা' বলে জেনে এসেছি তাদের কী অবস্থা? যদি প্রশ্ন করা হয় ইলেকট্রন কি? উত্তর আসবে একটি মৌলিক কণা। কিন্তু তরঙ্গ-কণা দ্বৈততার ধারণা সত্য হলে ইলেকট্রনের তরঙ্গের মত আচরণ করার কথা। তেমন কোন নজির কি আছে? বিস্তর নজির আছে। আমরা এখানে শুধুমাত্র একটি উদাহরণ দেব। মার্কিন বিজ্ঞানী ডেভিসন এবং গারমার নিকেল কেলাসের (Crystal) উপর ইলেকট্রন ছুঁড়ে দিয়ে দেখতে পান নিকেল থেকে বিচ্ছুরিত ইলেকট্রনগুলো ঠিক অপবর্তিত আলোর মত আচরণ করছে। এর পেছনে চমৎকার পদার্থবিজ্ঞান আছে, তবে সেই প্রসঙ্গ এখানে টেনে নাই বা আনলাম। ডেভিসন ও গারমারের এই পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয় ইলেকট্রন 'কণা' বিশেষ বিশেষ পরীক্ষণে 'তরঙ্গ' ধর্ম প্রকাশ করে। ডেভিসন ১৯৩৭ সালে ইলেকট্রনের তরঙ্গ ধর্ম আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

তাহলে কি দেখা যাচ্ছে, কোয়ান্টাম জগতে আসলে কোন দৃঢ়াবদ্ধ কণা বা তরঙ্গের ধারণা নেই। বরং এই জগতে রাজত্ব করে তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা। 'কণা' আসল না কি 'তরঙ্গ"? এই প্রশ্নটি অনেকটা অবান্তর। কোনটিই আসলে 'আসল' নয়। পরিস্থিতি ও পরীক্ষণভেদে কখনো 'কণা' কখনো 'তরঙ্গ'। এর বেশি এই ছায়াজগৎ নিয়ে বলতে যাওয়া মুশকিল।

প্রবন্ধকার: প্রফেসর, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

তারারা আমাদের বন্ধু

সৌমেন সাহা

বন্ধু কে? প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এক প্রাজ্ঞ পণ্ডিত বড়ো কঠিন সংজ্ঞা দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তষ্ঠতি স বান্ধবঃ।

তার মানে, উৎসবে আমোদ-প্রমোদে, দুর্ভিক্ষে, এমন কী রাষ্ট্রবিপ্লবে, আবার রাজদ্বারে অর্থাৎ কি-না আদালতে এবং শ্মশানেও যে সঙ্গে থাকে সে-ই নাকি বন্ধু।

আমরা সচরাচর যাদের বন্ধু বলে থাকি বা বন্ধু বলে যাদের মনে করে থাকি, তারা কি সবাই বর্ণিত ওই শর্তগুলো পূরণ করে- বা, প্রয়োজন হলে করবে, এমন ভরসা রাখি? নিশ্চয় নয়। এই তালিকা ধরে বন্ধু খুঁজতে হলে, সেই কে কোথায় আছে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়, তার মতো অবস্থা হবে। শত্রু বা অবন্ধুরা ক্রমশ দলে ভারি হবে, বন্ধুর খোঁজ মিলবে না। অথচ, আমার কোনো বন্ধু নেই, এমন কথা ভাবতেও যেন খারাপ লাগে- তাই-ই না? তাই আমরা করি কী, যাহোক তাহোক করে বন্ধু বানিয়ে নেই- আলাপ-পরিচয় আছে কিন্তু অনাত্মীয় এবং মোটামুটিভাবে সমবয়সী, এমন হলেই তাকে বন্ধু বলে ধরে নেই, সহপাঠী বা সহকর্মী বা প্রতিবেশী হলে তো কথাই নেই। এর ফলও অনেক সময়ে হাতে হাতে ফলে। অনেক সময়েই তথাকথিত এই বন্ধুদের দৌরাত্ম্যে এমন উত্ত্যক্ত বা এমন ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় যে, দুঃখ করে বলি- এমন বন্ধু থাকতে আর কোনো শত্রু লাগে?

সমাজে বন্ধু কী-করে পেতে হয় তার সঠিক পথ বাতলাতে পারব না। শুধু একটা সূত্র ধরিয়ে দিতে পারি- বন্ধু পেতে হলে, বন্ধু হতে হয়। বন্ধুত্ব একটা পারস্পরিক ব্যাপার।

কিন্তু সমাজের বাইরে একদল বন্ধুর খোঁজ দিতে পারি। ওরা অবশ্যই আমাদের কারুর সমবয়সী নয়- ওদের বয়স সাধারণত কয়েক-শ কোটি বছরের কোঠায়। প্রতিবেশী? তা-ও নয়। ওদের মধ্যে যে আমাদের সবচেয়ে কাছে তারই দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার (বা প্রায় ৭ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল)। তার পরেরটি আছে প্রায় ৪০ লক্ষ কোটি কিলোমিটার (বা প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি মাইল) দূরে। বাকিরা আরও আরও দূরে। কিন্তু দূরে থাকলেও, সঙ্গ ওরা দেয়- সর্বত্র, সর্বক্ষণ। সেদিক থেকে ওরা যে কোনো পণ্ডিতের যে কোনো কূট শর্তকে নিখুঁতভাবে পূরণ করে। ওরা সঙ্গে আছেই।

ওরা আছে আকাশে। রাতেও আছে, দিনেও আছে। আকাশ মেঘে ঢাকা না-পড়ে গেলে ওদের দেখা যায়- রাতের আকাশে অনেককে একসঙ্গে, দিনের আকাশে একটিকে একা। চাঁদনি রাতে তুলনায় বেশ কিছু কম, অন্য রাতে বেশি। তেমনই শহরাঞ্চল থেকে কম, অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশি।

ওদের মধ্যে একটির কাছে তো আমাদের ঋণের সীমা-পরিসীমা নেই- তাকে বাদ দিলে আমাদের জীবন একেবারে অচল। অন্যগুলোও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের নানা রকম সাহায্য করেছে অতীতে, চাইলে আজও করে। হ্যাঁ, আমি আকাশের তারাদের কথা বলছি।

যদিও সর্বক্ষণই ওরা আছে, তারারা কিন্তু দিনে-রাতে যেন আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। দিনের আলোয় ওরা গা ঢাকা দিয়ে থাকে। তখন পৃথিবীর মাটি থেকে বা মাটির কাছাকাছি যে বায়ুমণ্ডল আছে সেখান থেকে ওদের দেখা সম্ভব নয়- সম্ভব শুধু পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়ে, বা গাগারিন, নীল আর্মস্ট্রং প্রভৃতির মতো ওই বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে যেতে পারলে। কিন্তু দেখা যাক বা না-যাক, ওরা পালাক্রমে, কিছু-না-কিছু সংখ্যায় আকাশে থাকেই। কবি এক হিসাবে ঠিকই বলেছেন, "রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।"

প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর আমাদের সমাজ, সংসারের বাইরে যে আশ্চর্য সুন্দর এক জগৎ আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, আমরা অনেকেই তা লক্ষ্যও করিনা। আমাদের স্বভাব অনেকটা যেন রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পের নায়ক মৃত্যুঞ্জয়ের মত- মুক্ত, অনাবৃত, অনায়াস-লভ্য সম্পদকে আমরা প্রায়শ সম্পদ বলে চিনতেই পারি না। অস্থির হই অন্য, (অদেখা) অনিশ্চিত ভোগোপকরণের সন্ধানে।

কিন্তু যাঁরা চেনেন তাঁরা অবশ্য জানেন মেঘমুক্ত, নির্মল, রাতের আকাশ সুস্থ অবসর-বিনোদনের, নির্মল আনন্দ উপভোগের কী এক বিচিত্র সম্ভার। প্রকৃতি প্রতিরাতে তা আমাদের সামনে মেলে ধরে অযাচিতভাবে।

আসলে আকাশ দেখার- অর্থাৎ, অবসর মতো আকাশের দিকে চেয়ে থাকার, সেখানকার নানা জ্যোতিস্কের ভিড়ের ভিতর থেকে বিশেষ বিশেষ জ্যোতিস্ককে চিনে নেয়ার বা খুঁজে বার করার, তাদের নাম ও অন্যান্য পরিচয় সংগ্রহ করার বা স্মরণ করার- এক বিশেষ আনন্দ আছে, আছে এক বিশেষ পরিতৃপ্তি। সে আনন্দের সঙ্গে দেশ ভ্রমণের আনন্দ বা প্রিয়জন সন্দর্শনের আনন্দের মিল আছে। সে পরিতৃপ্তির স্বাদ জানা আছে ডাকটিকিট, মুদ্রা প্রভৃতির সফল সংগ্রাহকের। আকাশ দেখাকে নেশার সঙ্গেও হয়তো তুলনা করা চলে। এ নেশায় একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে, ফিরে ফিরে তার আকর্ষণে ধরা দিতে হয়। কিন্তু এ নেশায় খরচ নেই, শরীর-মনের ক্ষতি হবার কোনো আশঙ্কা নেই- এক কথায়, এতে কোনো কুফল নেই। আছে শুধু সময় কাটাবার, অন্তত সাময়িক ভাবে মনকে সজীব, উৎফুল্ল করে তোলার এক সুন্দর উপায়।

আকাশের যে এক বিচিত্র আবেদন আছে, দেশ-বিদেশের অনেক মননশীল মানুষ বিশেষভাবে সে কথার উল্লেখ করেছেন, নিজেদের জীবনচর্যায় তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সাম্প্রতিক কালের দুজন অগ্রগণ্য ভারতীয়দের কথা বলি। পণ্ডিত নেহরুকে বলতে শুনেছি যে, জীবনের নানা আবিলতা থেকে মুক্ত হতে, সুস্থ মাত্রাবোধ ফিরে পেতে তিনি মাঝে মাঝে দৃষ্টিসোপান বেয়ে আকাশে গিয়ে অবগাহন করতে ভালোবাসেন। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ছোটোবেলায় ড্যালহাউসি পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সেখানে বেশ কয়েক রাত ধরে আকাশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। আর, সে-পরিচয়ের সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ সানন্দে, সযত্নে পরিপোষণ করেন তাঁর সারা জীবন ধরে। তাঁর গানে, কবিতায় অজস্র উপমায় তাঁর আকাশপ্রীতির পরোক্ষ নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে রেখেছেন। ইংরেজিতে লেখা জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত সাগ্রহে সংগ্রহ করে পড়েছেন। তাঁর নিজের আস্বাদ করা আনন্দ যাতে অন্যেও আরও সহজে পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে জগদানন্দ রায় প্রভৃতিকে উৎসাহ দিয়েছেন ওই বিষয়ে গ্রন্থরচনায়, অবশেষে শেষজীবনে নিজেই সে-কাজে হাত লাগিয়েছেন- মৃত্যুর অল্প কয়েক বছর আগে আমাদের উপহার দিয়েছেন 'বিশ্ব-পরিচয়'।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের আকাশপ্রীতি সম্পর্কে আরও একটি কথার উল্লেখ হয়তো বাহুল্য বিবেচিত হবে না। উল্লেখ্য কথাটা এই যে, মহর্ষির মুখে শোনা তারা, গ্রহ প্রভৃতির বৃত্তান্ত বালক রবীন্দ্রনাথের এত ভালো লাগত,

উনি তার ভিত্তিতে ক্রমশ এক বিরাট প্রবন্ধ লিখে ফেলেন। তখন তাঁর বয়স বছর বারো হবে। তাঁর স্বীকৃতি অনুযায়ী সেটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম ধারাবাহিক রচনা। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ সে লেখাকে সলজ্জভাবে "কাঁচা" বলে বর্ণনা করেছেন কিন্তু লেখার প্রেরণা সম্পর্কে অসংশয়ে লিখেছেন, "স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম।"

তারারা যে আমাদের অবসর-বিনোদনের এক চিত্তাকর্ষক উপায় হতে পারে, তারা চেনা যে এক সুন্দর 'হবি' বা শখ হতে পারে, তার প্রধান কারণ ওদের বৈচিত্র্য। কত বৈচিত্র্য আছে তারাদের মধ্যে- কোনোটি রীতিমতো উজ্জ্বল, কোনোটি মাঝারি, কোনোটি যেন কোনোক্রমে মিটমিট করছে; কোনোটি লাল রঙের, কোনোটি নীলাভ, কোনোটি অন্য কোনো রঙের! তাছাড়া কলাকৌশল বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে জানা যায় কোনটি কত দূরে, কোনটি বড়ো বা কোনটির ওই ধরনের আরও কী কী বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ মানুষের ও-সব ব্যবহার করার সুযোগ না-ও যদি-বা থাকে, যাঁরা জানেন তাঁদের সূত্রে তথ্যগুলো জেনে নেওয়া কিছু কঠিন নয়।

তারাদের সবার আলাদা আলাদা নাম আছে। কারোর কারোর একাধিক। নামগুলো এরা পেয়েছে বিভিন্ন সূত্রে, নানাভাবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, একটি তারার নাম প্রাচীন ভারতবর্ষে দেয়া হয়েছিল বাণরাজ; সেই তারাটিরই আরবদেশে নাম হয় রাইগেল (Rigel), আর সে-নাম পরে ইউরোপেও প্রচলিত হয়। আবার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ওঁদের নিজস্ব আলাপ-আলোচনায় ওই তারাটিকেই অনেক সময়ে ওঁদের নিজেদের দেয়া এক নামে অভিহিত করে থাকেন- বিটা অরাইয়ানিস (Beta Orionis)। ও-তারাটি আছে শীতের আকাশের সুপরিচিত 'মণ্ডল' (constellation) কালপুরুষ বা অরাইয়ান (Orion)-এর মধ্যে।

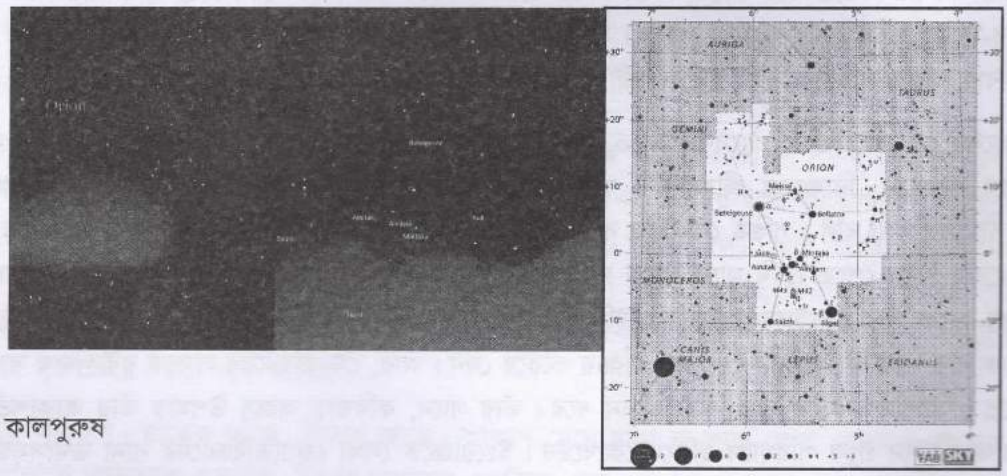

চিত্র : কালপুরুষ

তারা চেনাকে এক মজার ব্যাপার করে নেওয়া যায়। আগেই পরোক্ষভাবে সে কথা বলেছি। এই মজার কিছুটা আসে ওদের নামগুলো থেকে। কারণ, নামগুলো অনেক ক্ষেত্রেই খুবই সুন্দর, আর নামগুলোকে ঘিরে অনেক সময়ে বেশ সুন্দর সুন্দর উপাখ্যান আছে।

বাণরাজ তারাটির নামোল্লেখ এখুনিই করেছি। তারাটি আছে কালপুরুষমণ্ডলটির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে। ওই তারাটির একটু উত্তরে, কালপুরুষমণ্ডলীই, প্রায় নিখুঁত এক সরলরেখায় সমদূরত্বে সাজানো পর পর তিনটি তারা আছে। ভারতবর্ষে এই তারা তিনটির নাম পশ্চিম থেকে পূর্বে যথাক্রমে চিত্রলেখা, অনিরুদ্ধ আর ঊষা। এরা মহাভারতের এক রোমান্টিক উপাখ্যানের তিনটি প্রধান চরিত্রের নামে নাম পেয়েছে। বানরাজের সঙ্গেও কাহিনির যোগসূত্র আছে। ঊষা দৈত্যরাজ বানরাজের দুহিতা। অনিরুদ্ধ তাঁর জামাতা- যদিও তাঁর অমতে ঊষাকে বিয়ে করার দরুণ জামাতা হিসাবে সমাদর বা স্বীকৃতি লাভে বঞ্চিত ছিলেন। আর চিত্রলেখা? সে ছিল রাজকন্যার সহচরী; তার ভূমিকা ছিল ঊষার গোপন অভিসারে সহায়তা করার। এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে- দেশি বা বিদেশি।

শুধু প্রদত্ত নামেই নয়, নামকরণের ব্যাপারেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ মজার বৃত্তান্ত আছে। কতগুলো মজার নাম অবশ্য সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে এসব নামগুলো কবে, কীভাবে, কাদের দেওয়া, তা জানা নেই। কিন্তু কতকগুলো নাম প্রদত্ত হয়েছে বিগত কয়েক শতকের মধ্যে- মজার বৃত্তান্তগুলো আসে তাদেরই কতকগুলো থেকে। যেমন একটি তারার নাম হল কর ক্যারলাই (Cor Caroli), ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ 'চার্লসের অন্তঃকরণ', নামটি দিয়েছিলেন ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জন ফ্ল্যামস্টিড (John Flamsteed), তাঁর রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ- চার্লস (দ্বিতীয় চার্লস) ছিলেন ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন রাজা, আর তাঁর আদেশেই ইংল্যাণ্ডের 'রাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী' বা Astronomar Royal-এর গুরুত্বপূর্ণ পদটি প্রথম সৃষ্ট হয় যে পদে নিযুক্ত হন ফ্ল্যামস্টিড। (পাছে কেউ কিছু ভুল ধারণা করে বসেন তাই এখানে উল্লেখ থাকা ভালো যে, ফ্ল্যামস্টিডের যোগ্যতার কোনো ঘাটতি ছিল না। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের ভিত্তিতে আজও- প্রায় তিন-শ বছর পরেও- তিনি স্বনামধন্য হয়ে আছেন)। রাজভক্তি নয়, সেবক প্রীতির নিদর্শন রেখে গেছেন আকাশের বুকে আর এক প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। নাম তাঁর জুসেপি পিয়াৎসি (Giuseppe Piazzi)। ইতালির এই জ্যোতির্বিজ্ঞানী তাঁর এক সহকারীর কাজে খুবই খুশি হয়েছিলেন। অনুগত সেই সেবককে পুরস্কৃত করতে উনি আকাশে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি তারার নামকরণ করেছিলেন সুয়ালোসিন (Sualocin) আর রোটানেভ (Rotanev)। সে নাম আজ প্রায় দুইশ বছর ধরে চরছে। পিয়াৎসি নিজে অমর হয়ে আছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর নানা আবিস্কারের কৃতিত্বে; আর সেবক নিকোলাউস ভেনাটর (Nicolaus Venator) অমর হয়ে রয়েছেন দুটি তারার নামে। তাঁরই নামের দুটি অংশের বানান উলটিয়ে ওই তারা দুটির নাম হয়েছে যে- Nicolaus থেকে Sualocin আর Venator থেকে Rotanev।

ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জন ফ্ল্যামস্টিড

ইতালির জ্যোতির্বিজ্ঞানী জুসেপি পিয়াৎসি

নিকোলাউস ভেনাটর

এই রকম বিচিত্র সব তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে নতুন তারা চেনার দারুণ মজা। আবার চেনা তারাদের বারবার দেখতেও ভালোই লাগে- নতুন বন্ধুত্বের পরিবর্তে পাওয়া যায় পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আবার দেখা সাক্ষাতের ভিন্নতর স্বাদ।

তারারা সঙ্গ দিয়ে আমাদের অবসর-বিনোদনে সাহায্য করে। ওরা সেই হিসাবে অবশ্যই আমাদের বন্ধু। কিন্তু শুধু ওই দিক থেকেই নয়। তারারা অন্যভাবেও আমাদের সাহায্য করে, বন্ধুর মতো উপকার করে- অতীতে করেছে দারুণভাবে, আজও আমাদের প্রয়োজন হলেই করতে পারে যদি আমরা চেনাশোনার সম্পর্কটা রাখি।

আজ আমারে হাতে হাতে ঘড়ি। ঘরে ঘরে ক্যালেণ্ডার। আর, দরকার হলেই ফস করে ম্যাপ বা কম্পাস বার করতে পারি। আজ সব তৈরি। কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসের ফেলে আসা দিনগুলো সব এমন ছিল না, অথচ দিকনির্ণয় বা কালনির্ণয়ের প্রয়োজন মানুষের সে যুগেও বিশেষ কম ছিল না। তখন মানুষের কাছে তারা-ভরা আকাশ ছিল একাধারে ঘড়ি ও ক্যালেণ্ডার, ম্যাপ আর কম্পাস। তখন মানুষ মনোযোগ দিয়ে তারাদের লক্ষ করত, ভালো করে চিনে রাখত। 'ধ্রুবতারা' বা পোল স্টার (Pole Star)-র মতো তারা তাদের উত্তরদিক আর সেই সূত্রে অন্যান্য দিকের হদিস দিত। আর 'সপ্তর্ষিমণ্ডল' বা আরসা মেজর (Ursa Major)-এর মতো দলবদ্ধ তারারা সাহায্য করত ধ্রুবতারার মতো বিশিষ্ট তারাদের খুঁজে পেতে। কথাটার কি কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে? যদি কারোর না-জানা থাকে তো তাদের উদ্দেশ্যে বলি- এখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের যে কোনো জায়গা থেকে- ব্যতিক্রম শুধু যার নাম 'উত্তর মেরু' (North Pole)। সেই জায়গায়- আকাশ লক্ষ্য করলে যে কোনো রাতের যে কোনো সময়ে দেখা যাবে যে, ধ্রুবতারা রয়েছে উত্তর আকাশে 'দিক চক্ররেখা' বা 'দিকচক্র' (horizon) এর উপরে যে 'উত্তর বিন্দু' (North Point) আছে তার প্রায় নিখুঁত উপরের কোনো এক জায়গায় এবং রাতের প্রহরে প্রহরে তার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না, যা অন্য যে কোনো জ্যোতিস্কের ক্ষেত্রে সহজেই দেখা যায়। আর সপ্তর্ষির উত্তর প্রান্তের দুই তারা ক্রতু আর পুলহ-কে বিদেশি নামে, যথাক্রমে ডুবে (Dubbe) আর মেরাক (Merak)-কে কল্পনার সরল রেখা দিয়ে যুক্ত কওে ক্রতুর দিকে কিছুটা বাড়ালেই ধ্রুবতারায় উপণীত হওয়া যায়, তা সে আকাশে সপ্তর্ষির অবস্থান যাই হোক না কেন।

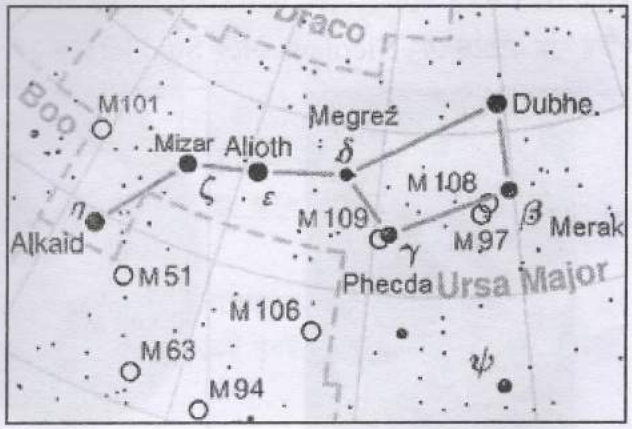

চিত্র : সপ্তর্ষিমণ্ডল

আবার ধ্রুবতারার মতো তারারা আর একটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, আর সে বৈশিষ্ট্যও মানুষের যথেষ্ট কাজে লাগতে পারে- খুবই লেগেছে, আগের দিনে। বৈশিষ্ট্যটা এই যে, উত্তর দিক চক্ররেখা থেকে অমন তারার উচ্চতা নির্দেশ করে দর্শক পৃথিবীপৃষ্ঠের কোথায় আছে, তার 'অক্ষাংশ' (latitude) কত।

তারাদের সাহায্যে আগের যুগের মানুষ দিকনির্ণয় করত, এ-কথা বলেছি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে একটি উদ্বৃতি দিয়ে কথাটা সপ্রমাণ করি। মহাভারতের জতুগৃহ-দাহের কথা নিশ্চয় অনেকের জানা আছে। কৌরবরা ছলে, বলে, কৌশলে পাণ্ডবদের বিনাশ ঘটাতে চেয়েছিল, আর তাদের নানা কুপ্রচেষ্টার মধ্যে একটি ছিল এই জতুগৃহদাহ। পাণ্ডবদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত জনপদ বারণাবতে জতু অর্থাৎ গালা দিয়ে একটি নকল বাড়ি তৈরি করিয়ে কৌরবরা তাতে পাণ্ডবদের কিছুদিন থাকার ব্যবস্থা করে। উদ্দেশ্য সহজ-দাহ্য পদার্থ দিয়ে গঠিত বাড়িতে পাণ্ডবরা থাকাকালে একদিন রাত্রে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে তাদের পুড়িয়ে মারা। কৌরবরা তাদের পরিকল্পনা মতো যথাসম্ভব অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু পাণ্ডবরা মরেনি- তারা মাটির নিচে এক সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করিয়ে সুযোগমতো সেই পথে পালিয়ে গিয়েছিল। এই উপায়টা এবং বুদ্ধিটা পাণ্ডবদের আগে থেকে দিয়ে রেখেছিলেন তাদের পিতৃবৎ মহামতি এবং মহাজ্ঞানী বিদুর। বিদুর ছিলেন সর্বতোভাবে পাণ্ডবদের দিকে কিন্তু লৌকিক কারণে প্রকাশ্যভাবে তাঁর সমর্থন বা সহায়তা জানাতে পারতেন না। উনি তাই কতকটা হেঁয়ালির ভাষায় পরোক্ষভাবে পাণ্ডবদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, কীভাবে রাতের অন্ধকারে ওরা পালাতে পারে। বলেছিলেন, "চরন্ মাগান্ বিজানাতি, নক্ষত্রৈঃ বিন্দতে দিশঃ।" অর্থাৎ, চলাফেরা করা থাকলে- অবশ্যই দিনের বেলায় রাস্তাঘাট চিনে রাখা যায়, আর রাতের আকাশে তারাদের দেখলে দিক ঠিক করা যায়।

হিন্দু মহাকাব্য মহাভারতের চেয়ে প্রাচীনতম এক রচনা থেকে পরোক্ষ এক সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা যাক। 'ছান্দোগ্য উপনিষদ'-এর বর্ণিত একটি কাহিনিতে আছে যে, ঋষি সনৎকুমারের কাছে 'ব্রহ্মবিদ্যা' শিক্ষায় আগ্রহী নারদ নিজের বিশেষ যোগ্যতা বর্ণনা-প্রসঙ্গে 'নক্ষত্রবিদ্যা' অর্থাৎ তারাসংক্রান্ত চর্চায় ওঁর পারদর্শিতার উল্লেখ করেছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তারাদের সম্পর্কে সম্যক পরিচয় থাকা সে-যুগে কী-রকম মূল্যবান বলে বিবেচিত হত।

শুধু দিক নির্ণয় নয়, তারাদের অবস্থান লক্ষ করে কাল নির্ণয়ও করা যায়- যদি তারাদের গতিবিধির খোঁজখবর ঠিকমতো রাখা যায়। কথাটার উল্লেখ আগেই করেছি। বুঝিয়ে বলি।

ধরা যাক কোনো এক সন্ধ্যায়, ছয়টা নাগাদ, রোহিণী বা অ্যালডেবারান (Aldebaran) নামে পরিচিত তারাটিকে দেখা গেল মাঝ-আকাশে- বা সেখান থেকে সরাসরি উত্তরে বা দক্ষিণে কোথাও। তাহলে মাঝরাতে- মানে বারোটা নাগাদ- রোহিণী অস্ত যাবে, আর তার আগে যে কোনো সময়ে রোহিণী পশ্চিমাকাশে কতটা নেমেছে তা থেকে সন্ধ্যার পর কতটা সময় কেটেছে তার একটা নির্ভরযোগ্য আন্দাজ পাওয়া যাবে। কারণ আকাশের পটভূমিতে যে কোনো তারা সমবেগ-কিছুটা সময়ে সে-তারা যতটা সরে যায়, তার দ্বিগুণ সময়ে সরে যাওয়াটাও আগের তুলনায় ঠিক দ্বিগুণই হয়।

আকাশ দেখে সময় নির্ধারণ করার কথাটা শুনতে আজ আমাদের কাছে যতটা হাস্যকর লাগছে বা লাগতে পারে, আসলে ততটা নয় কিন্তু। এক সময়ে কাল-নির্ধারণের এটা এক যথেষ্ট প্রচলিত পদ্ধতি ছিল, গ্রাম-জীবনে কোনো কোনো শ্রেণির মানুষের কাছে এখনও একেবারে পরিত্যক্ত নয়। বিশেষত দিনের আকাশের

তারা অর্থাৎ সূর্যের সাহায্যে গঠিত 'সূর্যঘড়ি' (sundial) এক সময়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল- আজও তার কমবেশি ব্যবহার আছে। আর, বর্তমানকালে সময় নির্ধারণের কাজে আমরা যেসব ঘড়ি ব্যবহার করে থাকি, এই সেদিন পর্যন্ত- কোয়ার্টস (quartz) এর বিচিত্র ধর্ম আবিস্কারের আগে পর্যন্ত- তাদের প্রধান ভিত্তি বা অবলম্বন ছিল আকাশে তারাদের সমবেগ আবর্তন।

তারাদের অবস্থান-সংক্রান্ত আরও একটি ঘটনা মানুষের অশেষ উপকার সাধন করেছে। সেই ঘটনা থেকেই মানুষের পঞ্জিকার বা ক্যালেণ্ডারের উৎপত্তি হয়েছে। অতএব, তারাদের এই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের সুফলটাও পাওয়া গেলে কাল-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। ঘটনাটা এই যে, আকাশের পটভূমিতে তারাদের স্থান-পরিবর্তন সূর্যের চেয়ে একটু দ্রুততর। যেহেতু আকাশ গোলাকৃতি এবং এই স্থান-পরিবর্তন সবার ক্ষেত্রেই একমুখে এবং (মোটামুটিভাবে) বৃত্তাকৃতি পথে সংঘটিত হয়, অতএব কথাটাকে এইভাবেও বলা যায় যে, আকাশের পটভূমিতে তারাদের আবর্তন সূর্যের চেয়ে কিছুটা দ্রুততর। অবশ্য আসলে এ সবই হচ্ছে 'আপাতগতি' (apparent motion)-র ব্যাপার, 'প্রকৃত গতি' (real motion)-র নয়- কী তারাদের ক্ষেত্রে, কী সূর্যের। আসলে পৃথিবী ঘুরছে তাই সূর্য আর তারারা দৃশ্যত স্থান পরিবর্তনশীল। কিন্তু পৃথিবী ঘুরছে একই সঙ্গে দু-ভাবে ঃ পৃথিবীর নিজের চারপাশে 'ঘূর্ণন' (rotation) আছে, আছে সূর্যের চারপাশে 'পরিক্রমণ' (revolution)। সময়ের হিসাব দিয়ে বলা যায়, পৃথিবীর 'আহ্নিক গতি' (diurnal motion) আছে, আর আছে 'বার্ষিক গতি' (annual motion)। আসলে আকাশের পটভূমিতে তারাদের আবর্তন শুধু পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফল, আর সূর্যের ক্ষেত্রে আহ্নিক গতির সঙ্গে পৃথিবীর বার্ষিক গতিও কাজ করে। মূলের এই পার্থক্যের দরুণ ফলেও পার্থক্য ঘটে। ফলটা হয় এই রকম ঃ আজ সন্ধ্যা 7 টায় যদি একটি বিশেষ তারাকে মাঝ আকাশে দেখি, তবে আগামীকাল তাকে ওই একই জায়গায় দেখব 7 টা বাজার প্রায় 4 মিনিট আগে, পরশু প্রায় 8 মিনিট আগে, আর ওইভাবে পরের প্রতিদিনই উত্তরোত্তর আরও প্রায় 4 মিনিট করে এগিয়ে এগিয়ে। অন্যভাবে বলা যায়, আজ 7 টায় মাঝ আকাশে দেখা তারাটিকে কাল 7 টায় মাঝ আকাশ থেকে একটু প্রায় এক ডিগ্রি পশ্চিমে সরে থাকতে, পরশু আরও প্রায় এক ডিগ্রি অর্থাৎ মোট দুই ডিগ্রি পশ্চিমে ইত্যাদি। এর পুঞ্জীভূত ফল হিসাবে একদিন সন্ধ্যা 7 টায় আকাশে তারাটিকে কোথাও দেখা যাবে না। হয়তো 6-30-এ বা 6 টায় দেখা যেতে পারে, কিন্তু পরে কোনো একদিন তা-ও যাবে না। তখন বুঝতে হবে তারাটি দিনের আকাশে চলে গেছে- আকাশের সেই অর্ধে অবস্থান করছে যেখানে সূর্যও অবস্থান করছে, অতএব তাকে এখন আর দেখা সম্ভব নয়। শেষ যেদিন পশ্চিম আকাশে, সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পরে, স্বল্পক্ষণের জন্য তারাটিকে দেখা যাবে। তারাটির সেদিনের অস্তগমনকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় ইংরেজিতে বলা হবে heliacal setting- বাংলায় বলা যেতে পারে 'সূর্যাভিগ অস্তগমন'। এর পর কয়েক মাস কেটে যাবে, তারাটিকে রাতের কোনো সময়েই আকাশে কোথাও দেখা যাবে না। তারপর যেন অকস্মাৎ একদিন শেষ রাতের আকাশে, সূর্যোদয়ের কিছু আগে, পুব দিকে তারাটি আবার আত্মপ্রকাশ করবে। সেদিন শুধু অল্পক্ষণের জন্য দেখা যাবে- কারণ, একটু পরেই উদীয়মান সূর্যের প্রথম আলোর আভায় তারাটি ঢাকা পড়ে যাবে। কিন্তু ওই দিন থেকে পর পর প্রতিদিনই তারাটি দেখা দিতে থাকবে- প্রতিদিন প্রায় 4 মিনিট করে আরও আগে আগে, অতএব দেখাও যাবে প্রতিদিন একটু বেশি সময় ধরে। এইভাবে এগোতে এগোতে তারাটি আবার একদিন তার পূর্ব অবস্থানে ফিরে আসবে পূর্ব সময়ে- সন্ধ্যা 7 টায়, মাঝ-আকাশে। আর

তারপর আবার ধীরে ধীরে, আগের মতোই, তার আত্মগোপন করার পালার পুনরাভিনয় শুরু হয়ে যাবে- তারাটি ধীরে ধীরে দিনের আকাশে চলে যাবে। কয়েক মাস অদৃশ্য থাকার পর শেষ রাতে প্রথম দেখা দেওয়ার ঘটনাকে- পূর্ববর্ণিত অস্ত যাবার বিশেষ ঘটনার মতো- বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে। ইংরেজিতে বলা হয় heliacal rising, বাংলায় হবে 'সূর্যাগিত উদয়'।

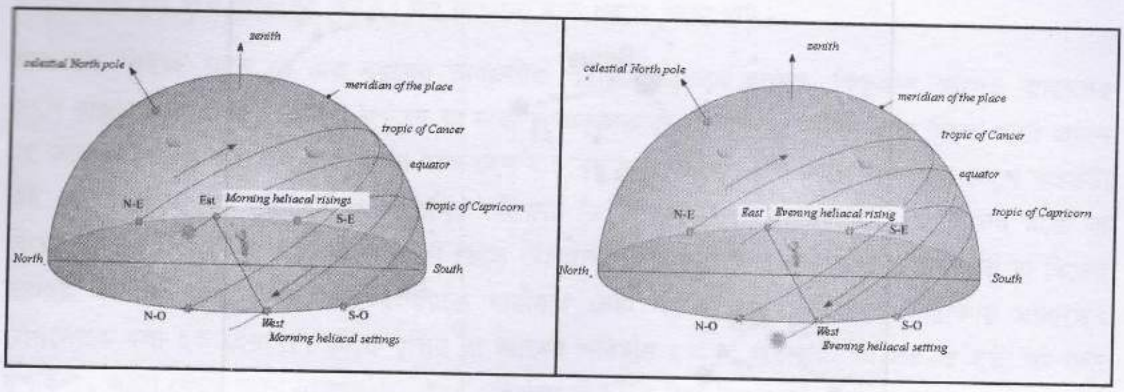

চিত্রে তারার অস্তগমনকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় ইংরেজিতে বলা হবে heliacal setting- বাংলায় বলা যেতে পারে 'সূর্যাভিগ অস্তগমন' সকালে ও সন্ধ্যায়

তারাদের সূর্যাভিগ অস্তগমন আর সূর্যাতিগ উদয়, তাদের সাময়িকভাবে আত্মগোপন করা আর পরে আবার আত্মপ্রকাশ করা- পর্যায়ক্রমিক এই ঘটনাগুলো পৃথিবীর সংঘটিত ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে তথা বর্ষচক্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিভিন্ন তারার সাহায্যে ওই ঘটনাগুলোকে ধৈর্য্যের সঙ্গে, মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করলে ঋতুদের আসা-যাওয়ার হিসাব রাখা যায় পূর্বাহ্নেই তার আভাস পাওয়া যায়। সেই ভিত্তিতেই পঞ্জিকা বা ক্যালেণ্ডার প্রণয়ন করা যায়। সুপ্রাচীনকালে মানবসভ্যতার পীঠস্থানগুলোতে এ-কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করা হত।

আমরা যে তারাটিকে লুব্ধক বলি, ইউরোপীয়রা বলে সিরিয়াস (Sirius)- যার জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত পোশাকি নাম অ্যালফা কেনিস মেজরিস (Alpha Canis Majoris)- সে তারাটিকে প্রাচীন মিশরদেশে দারুণ সম্ভ্রমের চোখে দেখা হত। তারাটির নাম ছিল ওখানে সোথিস (Sotihis)- ওটি নাকি ছিল শস্যসম্পদের দেবী আইসিস (Isis)-এর তারা। সে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব 3000 অব্দের কথা। তখন 'দক্ষিণায়ন'-এর শুরু হত আজকের হিসাবে 25 শে জুন তারিখে, আর মিশর থেকে প্রায় অবধারিতভাবে এই তারিখেই সোথিসের সূর্যাতিগ উদয় দেখা যেত। প্রাচীন মিশরীয়রা সেটা লক্ষ করতেন আর বুঝতেন- এবার বর্ষা আসছে, আসছে নীলনদের দু-কূলপ্লাবী বন্যা, তার যত কিছু ভালোমন্দর পসরা নিয়ে। প্রধানত নীলনদের অববাহিকায় বসবাসকারী সেকালের মিশরীয়দের জীবনে সেটা ছিল এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যাঁরা মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন মিশরের সবিশেষ অবদানের কথা জানেন, তাঁদের উচিত সোথিস বা লুব্ধক নামের তারাটির কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখা। সভ্যতাও তারাটির কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

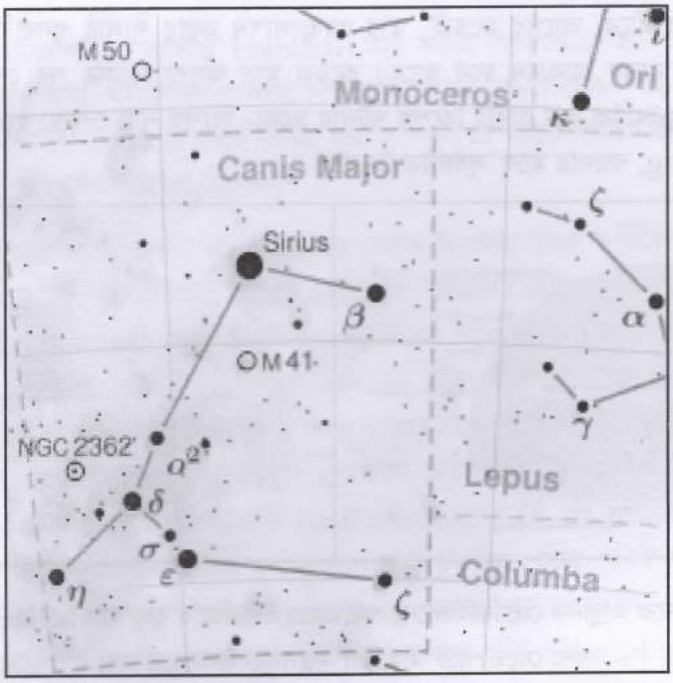

চিত্র : কালপুরুষের উজ্জ্বল লুব্ধক নক্ষত্র

ইতিহাসের পাতা উলটে পাঁচ হাজার বছর পার হয়ে আসা যাক। চলে আসা যাক সুপ্রাচীন মিশর থেকে উনিশ শতকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে তখনও ক্রীতদাস প্রথা চলছে, কিন্তু কিছুটা বাধা নিষেধের মধ্যে। উত্তরের রাষ্ট্রগুলোতে ওই অমানবিক প্রথাটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে শুধু তার বিস্তারের পথ রুদ্ধ হয়েছে- আইন হয়েছে নতুন করে কাউকে ক্রীতদাসত্বের শৃঙ্খল পরানো যাবে না, তবে যারা আগে থেকেই ক্রীতদাস হয়ে রয়েছে (মালিক স্বেচ্ছায় মুক্তি না-দিলে) তারা আমৃত্যু ক্রীতদাসই থেকে যাবে, এমন কি ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততিদেরও। হতভাগ্য এই ক্রীতদাসদের জীবনে মুক্তির আর কোনো পথই ছিল না- শুধু পালানোর পথ ছাড়া। পালাতে হবে-পালাতে হবে পেনসিলভেনিয়া (Pennsylvania) বা ওহাইও (Ohio) বা ইলিনয় (Illinois) বা আরও উত্তরে কোথাও। সেই পথই বেছে নিয়েছিল শত শত কৃষ্ণকায় মানুষ। হিংস্র পাহারাদার কুকুর এবং তাদের ততোধিক হিংস্র প্রভুদের চোখে ধুলো দিয়ে ওরা পালাত। অনেক সময়ে ধরা পড়ত, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসাবে অনেককে চরম মূল্য দিতে হত, কিন্তু তবু ঝুঁকি নিয়ে পালাবার চেষ্টা ওরা করত। কারণ ওদের কাছে বিকল্প জীবন ছিল মৃত্যুরই নামান্তর। ম্যাপ ছিল না, কম্পাস ছিল না- কিন্তু মাথার উপরে ছিল ধ্রুবতারা। ওদের চরম দূর্যোগপূর্ণ সেসব অভিযানের অনেক মর্মন্তুদ কাহিনি রচিত হয়েছে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক এবং বাস্তবধর্মী ঔপন্যাসিকদের লেখনীতে, আর সেসব রচনার অনেক পাতায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে ধ্রুবতারা। কারণ ধ্রুবতারা ছিল বহু ক্রীতদাসের মুক্তির দিশারি।

ধ্রুবতারা বা অন্যান্য তারাদের সাহায্যকারী বন্ধুত্বের ভূমিকা শেষ হয়ে যায়নি। আজও বিদেশে-বিভূঁইয়ে ঠেকায় পড়ে গেলে ওদের সাহায্য পাওয়া যায়। তাই তো আজও সৈনিক, নাবিক প্রভৃতিকে- এমন-কী 'বয়

স্কাউট' বা 'গার্ল গাইড'দেরও কিছু কিছু তারা চেনানো হয়। মহাকাশচারীদের প্রশিক্ষণেরও একটা অঙ্গ তারা চেনা। কারণ, মহাকাশেও দিগভ্রমের সমস্যা দেখা দিতে পারে, আর সেখানে কম্পাস থাকলেও তা কোনো কাজে লাগে না। তারারাই সেক্ষেত্রে ভরসা।

তারারা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েই আছে। শুধু বাড়ানো হাত ধরতে জানা চাই।

আজকাল 'কুইজ' নামে যে এক ধরনের তাৎক্ষণিক পরীক্ষার প্রচলন হয়েছে, কিছুকাল আগেও আমাদের দেশে অন্তত তার নামগন্ধও ছিল না। যে বা যারা আজকালকার এই কুইজে সঠিক উত্তর দিতে পারে প্রমাণ হয় তার বা তাদের বুদ্ধি খুব থাক বা না থাক বেশ বাইরের জ্ঞান আছে। এক কালে আমাদের দেশে কতকটা এই গোত্রের কিন্তু অবশ্যই আর এক শ্রেণির পরীক্ষার কিছুটা চল ছিল। ব্যবহার হত ছোটোদের মধ্যে বা বিয়ের আসরে। ছোটোরা দলে নতুন আসা ছেলে মেয়েদের কিছুটা অপ্রস্তুত বানানোর চেষ্টা করত বা বিয়ের আসরে বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ পরস্পরকে হারাবার চেষ্টা করত, ওই তাৎক্ষণিক পরীক্ষার মাধ্যমে। সেগুলোকে বলা হত হেঁয়ালি। তাতে বুদ্ধির বা জ্ঞানের পরিমাণ হত না অবশ্যই- কীসের কি হত, তা বলা মুশকিল। আগে থেকে জানা না থাকলে সেসব হেঁয়ালির ঠিকঠাক উত্তর দেয়া তো দূরের কথা, তাদের কোনও মানেই করা যেত না। একটা উদাহরণ দিই- পেটের মধ্যে হাত তার, চলে কিন্তু নড়ে না, কী বলত ভাই? এর উত্তর ছিল- ঘড়ি। আর একটা উদাহরণ- জানলা দিয়ে ঘর পালাল, গেরস্ত রইল বন্ধ; কেমন করে হল? উত্তর- জেলে জাল ফেলে মাছ ধরল। এমন কূটকচালি হেঁয়ালি কিছুটা মজাদারও বটে- অনেক ছিল।

একটি হেঁয়ালির বয়ান ছিল- এক থালা সুপারি গুনতে না পারে ব্যাপারি, মানে কী? উত্তর- তারাভরা আকাশে কত তারা তা আকাশের ব্যাপারিরাও (অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও) বলতে পারেন না। এই হেঁয়ালিটা যে একটু স্বতন্ত্র ধাঁচের তা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখে না। আগে উল্লেখ করা হেঁয়ালিগুলিতে শুধু সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা বা আরোপিত বিশেষ অর্থ জেনে নিতে পারলেই হয়, তারপর উত্তরে সত্যাসত্য নিয়ে আর কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু সুপারির হেঁয়ালিতে হেঁয়ালিকারের কথার মধ্যে আরও বেশি কিছু আছে। প্রশ্ন জাগে, সেটা কি ঠিক- অর্থাৎ। উত্তরটা কি সত্যি? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কি সত্যিই বলতে পারেন না- আকাশে কত তারা?

প্রখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী জেমস জিনজ্ (James Jeans)-এর একটি উক্তি আছে। এই প্রসঙ্গে সেটিকে স্মরণ করা যেতে পারে। উনি বলেছিলেন যে, সারা পৃথিবীর সাগরতীরে যত বালুকণা আছে আকাশে তত তারা আছে। পরোক্ষভাবে উনি নিশ্চয় এটাই বলতে চেয়েছেন যে, সংখ্যা যাই হোক সে সংখ্যা মানুষের পক্ষে নির্ণয় করা অসাধ্য।

এখন অনামা বাঙালি হেঁয়ালিকার আর খ্যাতনামা ইংরেজ বিজ্ঞানীরা কথাগুলো মনে রেখে দেখা যাক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দপ্তর থেকে কী খোঁজখবর পাওয়া যায়।

লব্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় যে আকাশের তারাদের এক তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিপার্কাস (Hipparchus) খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে, আর (কাল-নিরূপণের ব্যাপারে কিছুটা অনিশ্চয়তার কারণে চিনদেশে রচিত আর একটি তালিকাকে হিসাব থেকে বাদ দিলে) সেটাই হল প্রথম

তালিকা। হিপার্কাসের তালিকায় অন্ততপক্ষে 850 টি তারা স্থান পায়। উনি অবশ্যই তার চেয়ে বেশি তারা দেখেছিলেন, কিন্তু উনি শুধু উজ্জ্বল বা অন্য কোনো কারণে দৃষ্টি-আকর্ষক কিছু তারাদেরই ওঁর তালিকায় নিয়েছিলেন। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আর একটি তালিকা রচনা করেন আর এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি (Ptolemy)। এঁকে মিশরীয় গ্রিক বলে আখ্যায়িত করা যায়। এঁর তালিকাটিতে হিপার্কাসের তারাগুলো তো ছিলই, ছিল আরও প্রায় 200 টি বেশি তারা। পরবর্তী যুগে নানা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দ্বারা রচিত বিভিন্ন তালিকায় ক্রমশ আরও বেশি তারা যুক্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত হিপার্কাসের আর একটি অত্যন্ত মূল্যবান কাজের কথা এখানে উল্লেখ্য। উনি ঔজ্জ্বল্যের ভিত্তিতে তারাদের মোটামুটিভাবে শ্রেণি বিভক্ত করতে চেয়েছিলেন। উনি ওঁর তালিকায় প্রতিটি তারার সঙ্গে 1 থেকে 6 পর্যন্ত 'পূর্ণ সংখ্যা' (whole number) গুলোর মধ্যে একটি-না-একটিকে যুক্ত করেছিলেন, যে সংখ্যাটি হত সংশ্লিষ্ট তারাটির ঔজ্জ্বল্যের সূচক। এই সংখ্যাগুলোকে বা জ্যোতিস্কদের পরিভাষায় ইংরেজিতে বলা হয় magnitude। বাংলায় বলা যায় 'প্রভাঙ্ক'। হিপার্কাসের প্রণালীতে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল তারাগুলোর প্রভাঙ্ক হত 1, সবচেয়ে কমগুলোর 6, আর মাঝামাঝি তারাগুলোর ক্ষেত্রে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির ক্রম অনুযায়ী 5, 4, 3 এবং 2। 6 প্রভাঙ্কের তারাগুলোকে কোনোক্রমে দেখা যেত মাত্র।

হিপার্কাসের প্রণালীটি আজও প্রচলিত আছে-আরও অনেক প্রসারিত ও পরিমার্জিত রূপে। এখন আরও বেশি উজ্জ্বল জ্যোতিস্কদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রভাঙ্ক এখন 0, -1, -2 প্রভৃতি সংখ্যাও হতে পারে। আবার সূক্ষ্মতার খাতিরে প্রভাঙ্ক দুই পূর্ণসংখ্যার অন্তর্বর্তী যে কোনো সংখ্যাও হতে পারে-হতে পারে- 1.5, -2.34 প্রভৃতি যাবতীয় সংখ্যা। আর খালি চোখে দেখা যায় না, দেখতে হলে দূরবিন লাগে- অতএব হিপার্কাসের যুগে বা তার পরেও আরও প্রায় দেড় হাজার বছর পর্যন্ত যে-সব জ্যোতিস্কের অস্তিত্বও অজানা ছিল- এমন জ্যোতিস্কদেরও এখন এই প্রণালীর আওতায় আনা হয়েছে। এদের প্রভাঙ্ক অবশ্যই 6-এর বেশি- 6.5, 7, 7.1 প্রভৃতি নানা সংখ্যা। এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবিন দিয়ে যে জ্যোতিস্ককে দেখা সম্ভব হয়েছে তার প্রভাঙ্ক নির্ধারিত হয়েছে 25। আর অপর প্রান্তে রয়েছে আকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিস্ক- সূর্য; তার প্রভাঙ্ক প্রায়-27।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানেন যে, আকাশের যেসব তারার প্রভাঙ্ক 6-এর বেশি নয়- অর্থাৎ যাদের খালি চোখে সাধারণত মানুষ দেখতে পান- তাদের মোট সংখ্যা 5 হাজারের বেশি নয়, বরং কিছু কম। কিছু মানুষের দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ রকমের প্রখর; তাঁরা আরও কিছু বেশি তারা দেখতে পান। কিন্তু তাতেও সংখ্যাটা বেশি দূর যায় না- হতে পারে 6 হাজার বা তারও অল্প কিছু বেশি। এসব কিন্তু অনুকূল অবস্থায় দেখার কথা। আকাশে মেঘ থাকলে বা চাঁদের আলো থাকলে, বাতাসে ধোঁয়া বা কুয়াশা থাকলে বা আশপাশে কোনো কৃত্রিম আলোর উপদ্রব থাকলে, দেখতে পাওয়া তারার সংখ্যা অনেক কমে যেতে পারে। আবার, ওই যে হাজার পাঁচেক তারার কথা বলা হল, তাদেরও কোনো এক সময়ে পৃথিবীর কোনো এক জায়গা থেকে দেখা যায়, এমন নয়। রাতের বিভিন্ন প্রহরে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে আকাশে ভিন্ন ভিন্ন তারার দল থাকে। তাদের সম্মিলিত সংখ্যাটাই হচ্ছে সাধারণভাবে প্রায় 5 হাজার। অধিকন্তু জায়গাটা পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চল হওয়া চাই, তা না হলে সারা বছর ধরে আকাশ লক্ষ করেও লাভ নেই- সম্ভাব্য সব তারার দেখা মিলবে না।

দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের আকাশের ধ্রুবতারাকে অস্ট্রেলিয়ার মানুষ দেখতে পান না, আমরা বাংলাদেশ থেকে দেখতে পাই না ওদের আকাশের সিগমা অক্ট্যান্টিস (Sigma Octantis) নামের তারাটিকে। এই প্রসঙ্গে শেষ কথা- এক বিস্ময়ের কথা, মজার কথাও বটে- এই যে, আমরা কোনো এক সময়ে পৃথিবীর কোনো এক জায়গা থেকে কখনওই একসঙ্গে হাজার দুই-আড়াইয়ের বেশি তারা দেখি না। এই অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক তারাই চারিদিকে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থেকে আমাদের এমন এক দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায় যে মনে হয় ওরা অগণ্য।

প্রায় পাঁচ বা ছয় হাজার সংখ্যাটা কিন্তু শুধুমাত্র খালি চোখে দেখা সম্পর্কে প্রযোজ্য। দূরবিন ব্যবহার করলেই সংখ্যাটা অনেক বেড়ে যায়- দূরবিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে বাড়তে কয়েক কোটির ঘরে গিয়ে পৌঁছয়।

তারার একরকমের দেখা আছে। সে দেখা প্রত্যক্ষভাবে দেখা নয়, পরোক্ষভাবে দেখা। এতে করা হয় কি, দূরবীনের সঙ্গে ক্যামেরা যুক্ত করে ছবি তোলা হয়। দেখা যায় যে, রাতের আকাশের যে কোনো এক অংশে সরাসরি দূরবীন দিয়ে যত তারা দেখা সম্ভব, ঠিক সেই অংশেরই দূরবীনযুক্ত ক্যামেরায় গৃহীত আলোকচিত্রে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি আলোকবিন্দু ধরা পড়েছে। বোঝা যায় যে, এখানে আসলে তারা ছিল অনেক বেশি যাদের ক্ষীণ আলো দূরবীনের সহায়তা পেয়েও চোখে পদার্থকে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্দীপিত করতে পারেনি, কিন্তু পেরেছে অধিকতর সংবেদনশীল রাসায়নিক যৌগের প্রলেপ দেওয়া চিত্রপটকে। এইভাবে দেখতে পাওয়া তারাদেরও গণনার অন্তর্ভূক্ত করলে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় কয়েক হাজার কোটির মতো। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখন জানেন যে, আকাশে তারা আছে আরও অনেক বেশি। তাদের তারা হিসাবে- অর্থাৎ পৃথক, স্পষ্ট বিচ্ছিন্ন আলোর বিন্দুরূপে দেখা যায় না। দেখা যায় 'ব্রহ্মাণ্ড' বা গ্যালাক্সি (galaxy)-র রূপে।

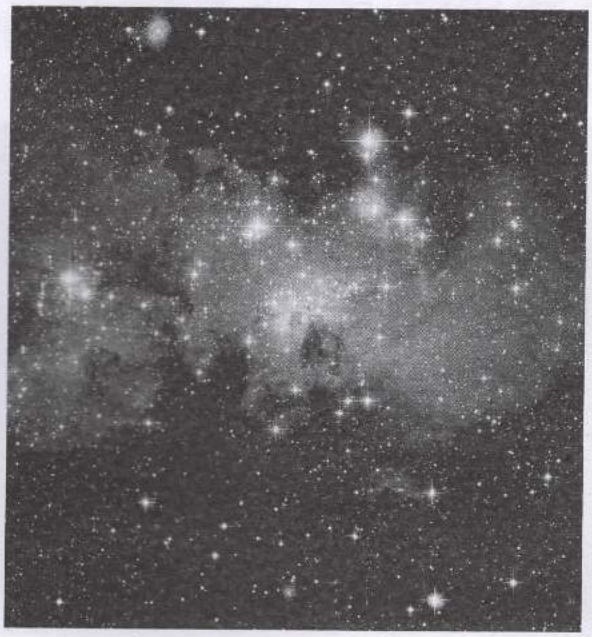

চিত্র : আন্তগ্যালাক্সীয় মহাকাশ

দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে-উত্তরোত্তর বিশাল থেকে বিশালতর দূরবীনের সহায়তার কারণেও বটে-এই শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যে, মহাকাশে তারারা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ওদের বিন্যাব বা বণ্টন (distribution) সর্বত্র সুষম (uniform) নয়। ওরা আছে মহাকাশের স্থানে স্থানে বিরাট বিরাট জোট বেঁধে- মাঝখানে মাঝখানে অনেক অঞ্চলকে সম্পূর্ণ খালি ফেলে রেখে। জোটগুলোকে বলা যায় 'গ্যালাক্সী'। মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলোকে 'আন্তগ্যালাক্সীয় মহাকাশ'। ইংরেজি নাম যথাক্রমে galaxy ও intergalactic space। আমাদের সূর্য, আমাদের খালি চোখে দেখা যত তারা এবং আরও অনেক বেশি তারা নিয়ে-সংখ্যায় মোট প্রায় 10 হাজার কোটি- একটি ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হয়েছে। আমরা এর মধ্যে আছি বলে এর নাম 'আমাদের ব্রহ্মাণ্ড' (Our Galaxy)। এর এক বিকল্প নামও আছে- 'ছায়াপথ গ্যালাক্সী' (Milky Way Galaxy)। আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ডগুলোর মধ্যে একটির নাম 'অ্যান্ড্রমিডা গ্যালাক্সী' (Andromeda Galaxy)। এটি আছে যে দূরত্বে তা অতিক্রম করতে আলোর সময় লাগে প্রায় 22 লক্ষ বছর- যে আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় 3 লক্ষ কিলোমিটারের (বা প্রায় 1,86,000 মাইলের) মতো। তুলনাগত বিচার-বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন যে এই গ্যালাক্সিটিতে তারা আছে আমাদের গ্যালাক্সির প্রায় তিন গুণ অর্থাৎ, প্রায় 30 হাজার কোটি। এর চেয়ে বেশি সংখ্যক তারা নিয়ে গঠিত গ্যালাক্সিও আছে। অবশ্য ক্ষুদ্রতর গ্যালাক্সিও যে না-আছে এমন নয়- ক্ষুদ্রতর অ্যান্ড্রমিডার চেয়ে, ক্ষুদ্রতর আমাদের চেয়েও।

তারারা যেমন জোট বেঁধে আছে, গ্যালাক্সিও তাই। এই বৃহত্তর জোটদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় ইংরেজিতে বলা হয় cluster of galaxies বা group of galaxies। বাংলা হোক 'গ্যালাক্সি জোট'। আমাদের গ্যালাক্সি যে জোটে আছে, সেই জোটেই আছে অ্যান্ড্রমিডা গ্যালাক্সি এবং আরও অনেক- গোটা তিরিশেক বড়ো বড়ো, আর বেশ কিছু ছোটো। এই জোটের নাম ইংরেজিতে Local Cluster বা Local Group, বাংলায় বলা যেতে পারে 'স্থানীয় জোট'।

চিত্র : গ্যালাক্সি জোট

অনেক জোট আবিস্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে জোট ছোটো হতে পারে, হতে পারে খুব বড়ো। এমন জোট আছে যেটি মাত্র 3 টি গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত। আবার এমন জোটও আছে যাতে জোটবদ্ধ হয়ে আছে প্রায় 10 হাজারের মতো গ্যালাক্সি।

তারাদের বা গ্যালাক্সিদের জোট বাঁধার প্রবণতার ব্যাপারে এটাই শেষ কথা নয়। আরও একটু আছে। অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিস্কার এবং সিদ্ধান্ত এই যে, কিছু কিছু ব্রহ্মাণ্ড জোট যুক্ত থেকে আর এক ধরনের জোট গঠন করে রেখেছে- ইংরেজিতে সাধারণভাবে supercluster, বাংলায় হোক 'মহাজোট'। এখন পর্যন্ত মহাজোট লক্ষিত হয়েছে মোট 12। এদের প্রতিটিতে গ্যালাক্সি জোট আছে কমপক্ষে 2 টি, উর্ধ্বপক্ষে 15 টি।

মহাজোটে বা জোটে বিধৃত হয়ে আছে বহু বহু ব্রহ্মাণ্ড আর প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে আছে রাশি রাশি তারা। এই তারাদের সম্পর্কে 'পরিসংখ্যানগত' (statistical) হিসাব অবশ্য খাড়া করা যাক- সেটা কিছু ফেলনা নয়, তার ভিত্তিতে অনেক গবেষণাধর্মী কাজকর্মও করা যায়। কিন্তু সেটা তো আর গণনা নয়। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়?

ইংরেজি বিজ্ঞানী জেমস জীনজের কথার ভাবার্থে ভুল নেই। কিন্তু সেটা খুবই স্বাভাবিক- জীনজ তো গ্যালাক্সি প্রভৃতির কথা জানতেন। অপরপক্ষে বাঙালি হেঁয়ালি রচয়িতা? তিনি সুপারি বলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন- খালি চোখে দেখা আলাদা আলাদা তারা? তাহলে উনি ভুল বলেছিলেন। ব্যাপারিরা ওইভাবে দেখা তারাদের গুণে ফেলেছেন। দ্রষ্টাভেদে সংখ্যাটার কিছু হেরফের হতে পারে কিন্তু গড়ের হিসাবে সংখ্যাটা 5 হাজারের মতো এবং তার চেয়ে একটু কম, অবশ্যই গণনাতীত কিছু নয়। কিন্তু মানুষের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিসীমার বাইরেও অনেক তারা আছে, সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিত যদি করে থাকেন হেঁয়ালিতে? সেটা খুব কষ্টকল্পনা নয়। কবি, দার্শনিক বা ওই গোছের লোকেদের কথায় অনেক সময়ে- সত্য হোক বা মিথ্যা হোক- অনেক ইঙ্গিত থাকে। সেক্ষেত্রে হেঁয়ালিকার নেহাত ভুল বলেননি- কারণ, ব্যাপারিরা এখনও গুনতে পারেননি। কোনোদিন পারবেন কি? কে জানে? হেঁয়ালিটা বোধ হয় হেঁয়ালিই থেকে যাচ্ছে।

মণ্ডল আর রাশি

তারাদের একটি ধর্ম ওদের আলাদা আলাদা করে চেনার এবং নাম দেয়ার কাজটা মানুষের পক্ষে সম্ভব এবং অনেকাংশে সহজও করে দিয়েছে। ওরা আকাশে আপেক্ষিকভাবে প্রায় নিশ্চল। তার মানে, রাতের প্রহরে প্রহরে এরা আকাশের একদিক থেকে অন্যদিকে সরে সরে যায় বটে, কিন্তু সে সব যাওয়া দর্শকের হিসাবে বা দিকচক্রের হিসাবে, নিজেদের হিসাবে নয়। ওরা সরে যায় দলবদ্ধ ভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে- এমনভাবে যে, তাতে ওদের নিজেদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বা অবস্থানগত অন্যান্য সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তুলনা দিয়ে বলা যায়, তারাদের গতি একদল সাধারণ পথচারীর পথ চলার মতো নয়, বরং যেন কুচকাওয়াজ করা সৈন্যদলের অগ্রগতির মতো। ফলে আজ সন্ধ্যায় যদি ঢাকার মতো কোনো এক জায়গা থেকে আমরা দেখি যে, আকাশের গায়ে পূবদিক ঘেঁষে কোথাও কতকগুলো তারা যেন একটি বর্গক্ষেত্র গঠন করে রেখেছে বা ইংরেজি অক্ষর W-র রূপে সজ্জিত হয়ে আছে, তাহলে আজ সারা রাত ধরে-যতক্ষণ তারাগুলোকে দেখা যাবে ততক্ষণ ধরে-তারাগুলোকে ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে সরে যেতে দেখব বটে, কিন্তু দেখব ওই একই আকারে, একই আকৃতিতে বিন্যস্ত থাকতে। শুধু আজ নয়, কালও তা-ই দেখব, পরশুও দেখব-দেখব সারা

জীবনের যত রাত ধরে। প্রতি রাত্রেই ওদের দেখব, এমন অবশ্য নয়। বছরের কয়েকটা মাস অবশ্যই দেখা যাবে না। কিন্তু যখনই দেখা যাবে, যাবে ওই একই রূপে- অপরিবর্তিত আকারে আকৃতিতে।

বিশুদ্ধ তত্ত্বের খাতিরে এখানে একটা কথার উল্লেখ থাকা উচিত। তারাদের আপেক্ষিক অবস্থানের যে কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না, এমন ঠিক নয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাণে হয়, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম যে-পরিবর্তন কোনো সাধারণ মানুষের-যিনি শক্তিশালী যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে আকাশ লক্ষ করবেন- কোনোমতেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবার নয়। দু-চার রাত, দু-চার মাস বা দু-চার বছরের মধ্যে তো নয়ই- এমন কী তাঁর সারা জীবনে নয়, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তিনি যত দীর্ঘায়ু হোন না কেন। ব্যাপারটা অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছেও বহুকাল পর্যন্ত অজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল। ওঁরা তাই তারাদের বর্ণনা করতেন 'নিশ্চল তারা' (fixed stars) বলে। আর সে বর্ণনা আজও একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি। তারাদের সম্পর্কে দুর্জ্ঞেয় এই তথ্যটি প্রথম ধরা পড়ে ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি (Edmond Halley)-র কাছে ১৭১৮ সালে- দূরবীন উদ্ভাবিত হবারও প্রায় 100 বছর পরে। দূরবীনের এক্ষেত্রে একটা বড়ো ভূমিকা ছিল ঠিকই, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট ছিল না। আসলে প্রয়োজন ছিল তুলনা করার- পূর্বতন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করা তারাদের অবস্থানঘটিত বিবরণের সঙ্গে পরবর্তীকালের সাধ্যমতো নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করা বিবরণের তুলনা। হ্যালি সেই কাজটাই করেছিলেন। আজও যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিযোগে তারাদের আকাশে স্থান পরিবর্তনের ব্যাপারটা সরাসরি বুঝতে পারেন, এমন নয়। প্রায়শই এমন হয় যে, বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানে পুঞ্জীভূত ফলটা ওঁদের যন্ত্রে ধরা দেয়। আর তখন মোট পরিমাণকে মধ্যবর্তী বছরগুলোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ওঁরা স্থির করেন গড়ে বছরে কী পরিমাণ স্থানচ্যুতি ঘটেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিভাষায় এই বার্ষিক পরিমাণকে বলা হয় তারাদের 'প্রকৃত গতি' (proper motion)। (এখানে এ কথা উল্লেখ করা বোধ হয় বাহুল্য যে, রাতের প্রহরে প্রহরে তারাদের যে স্থানচ্যুতি- আকাশের একদিক থেকে অন্যদিকে সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়, তা প্রকৃত পক্ষে তারাদের নিজস্ব গতি নয়। তারাদের পক্ষে ও গতি 'আপাত গতি' (apparent motion)। পৃথিবী তার 'অক্ষ' (axis) বা মেরুদণ্ডের চারপাশে লাট্টুর মতো-পশ্চিম থেকে পূবে ঘুরছে বলে, পৃথিবী থেকে তারাদের অমন ঘূর্ণমান দেখায়।) জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সাধারণত (প্রয়োজন বুঝে) 50, 25 বা 10 বছর অন্তর অন্তর ওঁদের হিসাবের কাগজপত্রে তারাদের প্রকৃত গতির দরুন যেটুকু অশুদ্ধি প্রবেশ করে বা করে থাকতে পারে তা সংশোধন করে নেন।

এই প্রসঙ্গে সার কথাটা দাঁড়ায় এই যে, যদিও তারাদের সম্পর্কে এক সময়ে নিঃসংশয়ে প্রযুক্ত 'নিশ্চল তারা;, এই অভিধা আজ আর সম্পূর্ণ সঠিক বা সার্থক বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দ্বারা বিবেচিত হয়। তবু অভিধাটি একেবারে সর্বাংশে পরিত্যাজ্যও ঠিক নয়। সাধারণ মানুষ তাঁদের শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চায়- বা এমন কি পুরোদস্তুর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও তাঁদের কিছু কিছু কাজেকর্মে- ওই নিশ্চলতার ধারণাটাই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন এবং করাটাই যুক্তিসংগত। যা তাঁর দৃষ্টিগোচর হবে না বা তাঁর কাজে ছায়াপাত করবে না, সে পরিবর্তন আছে না নেই তা নিয়ে তাঁর আর কিসের মাথাব্যথা?

তারারা যেহেতু আকাশের পটভূমিতে একে অন্যের তুলনায় নিশ্চল বা প্রায় নিশ্চল, তাই কোনো এক সময়ে আকাশের কোনো এক জায়গার তারাগুলোকে- বা তাদের মধ্যে নির্বাচিত কিছু তারাকে- কল্পনার রেখা দিয়ে যথাযথভাবে যুক্ত করে একটা মূর্তি বা নক্সা বা ওই রকম কিছু একটা গঠিত হয়েছে বলে মনে করা যায়, যার কারণে সেটা নেহাত সাময়িক অসার কল্পনা হয় না। কল্পিত গঠনকে বেশ স্থায়ীভাবে পাওয়া যায়- রাতের পর

রাত, বছরের পর বছর, এমন কী হয়তো বা শতকের পর শতক প্রায় অবিকৃত রূপে। অমন এক-একটি তারকাবিন্যাস বা তারকা সমাবেশকে বাংলায় বা সংস্কৃত, হিন্দি প্রভৃতি (অন্য অনেক) ভাষাতেও- বলা হয় 'মণ্ডল', ইংরেজিতে constellation (যে শব্দ দুটিকে ইতিপূর্বেই এই রচনায় বিশেষ কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ শব্দ দুটি বিশেষ অপরিচিত বা অজ্ঞাত বোধ হয় নয়)।

মণ্ডল-পরিকল্পনা নিশ্চয় অনেক রকমভাবে করা যায় এবং শুরুতে তা করা হয়েছিল, কিন্তু সম্ভাব্য সবগুলোর মধ্যে শুধু নির্বাচিত কতকগুলোকেই এখন মণ্ডল বলা হয়। ইতিপূর্বে উদাহরণ হিসাবে যে তারাদের দ্বারা গঠিত বর্গক্ষেত্র বা ইংরেজি অক্ষর W-র কথা বলা হয়েছে ওরা কাল্পনিক উদাহরণ নয়-অমন দুটি তারকাবিন্যাস প্রকৃতই উত্তর গোলার্ধের আকাশের দু-জায়গায় আছে এবং ওরা মণ্ডল বা মণ্ডলের অংশ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

কিন্তু মণ্ডলদের পরিকল্পনায় অর্থাৎ ওদের নির্বাচন এবং নামকরণে, আগে দারুণ বিশৃঙ্খলা ছিল। অবশ্য সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ নানান দেশের নানান মানুষ নিজেদের খেয়ালখুশিতে পরিকল্পনা করতেন। যতদূর জানা আছে, এ ব্যাপারে শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রথম চেষ্টা করেন খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের এক বরেণ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী-টলেমি (যাঁর নাম আমরা এই প্রবন্ধে আগে পেয়েছি)। তিনি সারিবদ্ধভাবে মণ্ডলদের একটি তালিকা রচনা করেন। সে তালিকায় 48 টি মণ্ডলের নাম, অবস্থান প্রভৃতির উল্লেখ বা বর্ণনা ছিল। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দ্বারা আরও কিছু মণ্ডল পরিকল্পিত হয়। এর প্রয়োজন ক্রমশ অনুভূত হচ্ছিল- বিশেষত দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশের কতকগুলো অংশকে চিহ্নিত করতে, যে অংশগুলো টলেমির কর্মক্ষেত্র মিশর থেকে দেখা সম্ভব ছিল না, অতএব যে অংশগুলো টলেমি বাদ দিয়েছিলেন। তাছাড়া টলেমির আগে বা পরে ভারতবর্ষ, চিন, মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি প্রধান সভ্যতার অন্যান্য পীঠস্থানগুলোতেও বেশ কিছু মণ্ডলের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু যোগাযোগের অভাবের কারণেই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, এই সব ভিন্ন ভিন্ন সূত্র থেকে আসা মণ্ডলগুলোর নাম বা গঠনের মধ্যে প্রচুর অমিল ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে, প্রধানত সাতটি তারার সাহায্যে গঠিত যে মণ্ডলকে ভারতবর্ষে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলা হয়েছে, ইউরোপে তার সঙ্গে আরও বেশ কিছু তারাকে যুক্ত করে কল্পনা করা হয়েছে বিরাট এক ভাল্লুকের দেহ-নাম দেয়া হয়েছে ল্যাটিন ভাষায় আরসা মেজর (Ursa Major), ইংরেজিতে গ্রেট বেয়ার (Great Bear)। আবার, মধ্যপ্রাচ্যের যাযাবর-বৃত্তির কিছু মানুষের কল্পনায় ওটি হয়ে পড়েছিল ভাল্লুক নয়- ঘোড়া। খুব বেশি দিনের কথা নয়, 1799 সালে এক ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানী লালাঁদ (Lalande) একটি নতুন মণ্ডলের পরিকল্পনা করেন। উনি আকাশের এক জায়গায় তারাদের সহযোগে একাধিক বিড়ালের অবয়ব কল্পনা করে নিলেন, আর তদনুসারে ল্যাটিন ভাষায় নাম দিলেন ফিলিস (Felis)-যা হচ্ছে ওই ভাষায় ওই বিশেষ প্রাণীটির নামের বহুবচনের রূপ। উনি বললেন, যেহেতু সুদীর্ঘ 60 বছর ধরে আকাশকে ঘিরে উনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন আর বিড়াল ওঁর অত্যন্ত প্রিয় জীব, অতএব উনি আকাশে বিড়ালদের একটু স্থান দিতে চাইলে কারোর তাতে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

লালাঁদ ছাড়া আরও কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী একান্ত ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে মণ্ডলদের যথেচ্ছ নামকরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একক খেয়ালিপনা বা দুর্বলতা নয়, একেবারে দলবদ্ধ খেপামির পর্যায়ে ব্যাপারটাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন একদল খ্রিস্টীয় ধর্মযাজক সপ্তাদশ শতাব্দীতে। তাঁরা চেয়েছিলেন প্রাচীনকালের বিশেষ করে অখ্রিস্টীয় সূত্র থেকে পাওয়া, নামগুলো সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হোক, পরিবর্তে প্রচলিত

হোক পূতপবিত্র খ্রিস্টীয় নাম। তাঁদের সুপারিশ অনুসারে একটি বিশেষ মণ্ডলের নাম হতে যাচ্ছিল সেন্ট পিটার (St. Peter)- এর নামে। তার পাশের একটি সেন্ট ম্যাথিউ (St. Mathew)- এর নামে। আর এই রকম সব বাকিগুলোরও। শুধু তাই নয়। এই ফতোয়া অনুসারে সূর্য এবং চন্দ্রের যথাক্রমে যিশুখ্রিস্ট এবং মাতা মেরির নামে নামকরণের প্রস্তাবও ছিল। এ প্রচেষ্টা অবশ্য বেশি দূর এগোয়নি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুমোদন করেননি তো বটেই। এমন কী কিছু সংখ্যক বুদ্ধিমান ধর্মযাজকেরও অসম্মতি ছিল। একজন আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী শেষোক্ত ধর্মযাজকদের আপত্তির সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, 'যিশুখ্রিস্ট এবার অস্ত যাবেন', 'মাতা মেরি-র আজ পূর্ণগ্রাস হবে' বা ওই জাতীয় অন্যান্য গর্হিত উক্তি করে মানবজাতির পাপ হবে। আর সে পাপের দায়ভাগ অবিমৃশ্যকারী নামকরণের দরুণ ওঁদের উপরেও অসবে, এই ভেবেই ওঁরা হয়তো পিছপা হয়েছিলেন।

কিন্তু মণ্ডলদের ব্যাপারে ওই ধরনের রুচি-অভিরুচির পালা এখন একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। 1930 সালে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিয়ন'- সংক্ষেপে যাকে 'আই.এ.ইউ.' (I.A.U.) বলে অভিহিত করা হয়- ও ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। মোট 88 টি মণ্ডলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, প্রতিটির সীমারেখা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, আর প্রত্যেক মণ্ডলের একটি ল্যাটিন নাম ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। এই মণ্ডলগুলো এমন কৌশল বা যত্ন নিয়ে গঠন করা হয়েছে এবং স্থিরীকৃত হয়েছে তাদের চতুঃসীমা যে, ওরা মিলিতভাবে সারা আকাশকে ঠিক ঠিক ঢেকে দিয়েছে দুই মণ্ডলে। না গেছে কোনো অংশ ছাড়, না হয়েছে কোথাও উপর-উপর। ফলে আকাশের প্রতিটি তারাই কোনো না কোনো মণ্ডলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে- কোনো একটি তারাও বাদ পড়েনি, আবার কোনোটি একাধিক মণ্ডলে ঢুকে যায় নি।

আসলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সুপরিকল্পিত হস্তক্ষেপের ফলে মণ্ডলের সংজ্ঞাটাই এখন আগের থেকে বেশ খানিকটা বদলে গেছে। আগে মণ্ডল বলতে বোঝাত আকাশের পটভূমিতে মোটামুটিভাবে একই দিকে বা একই অংশে আছে এমন কিছু সংখ্যক তারার এক বিন্যাস বা সমাবেশ যে বিন্যাস বা সমাবেশের সঙ্গে জানাশোনা কোনো কিছু সাদৃশ্য আছে বা অন্ততপক্ষে আছে বলে কল্পনা করা হয়েছে, আর সেইমতো যার নাম হয়েছে। মণ্ডলদের এই সংজ্ঞা এখনও অনেক সময়ে ব্যবহৃত হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কোনো উক্তির সঙ্গে সরাসরি বিরোধ ঘটার আশংকা না থাকলে। এটাই এখনও মণ্ডলের পরিগৃহীত বা প্রচলিত অর্থ। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োজনের বিচারে এই সংজ্ঞার একটু ত্রুটি আছে। এতে সব তারার স্থান-নির্দেশ হল না। এতে প্রাথমিকভাবে শুধু উজ্জ্বল তারারাই গুরুত্ব পায়- ওরাই স্থির করে দেয় কিসের সঙ্গে সাদৃশ্য স্বীকৃত হবে; বাকি তারাগুলো যদি খাপ খাওয়াতে পারে তো ভালোই, নয়তো ওরা উপেক্ষিত হয় বা মণ্ডল থেকে বাদ পড়ে যায়। তার মানে, আকাশের এক জায়গায় কতকগুলো উজ্জ্বল তারা যদি একটি বর্গক্ষেত্রের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চায় আর তার পাশের জায়গার তারাগুলো একটি ত্রিভুজের, তবে ওদের ধারে কাছে বা মাঝ থেকে অনুজ্জ্বল যে তারাগুলো ওই বর্গক্ষেত্র বা ত্রিভুজ গঠনে সাহায্য করবে না সে তারাগুলোকে হয়তো সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হতে পারে- তাদের স্থান হবে না এই মণ্ডলী, না অন্যটিতে।

প্রবন্ধকার : জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক ও গ্রন্থাকার, সাধারণ সম্পাদক : প্রাশ্নিক বিজ্ঞানাগার কেন্দ্রীয় শাখা, খুলনা।

প্রতিকুল আবহাওয়ায় ও মাটিবিহীন পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের প্রযুক্তি ও সম্ভাবনা

কৃষিবিদ ড. মো: শরফ উদ্দিন

বাংলাদেশ অত্যন্ত জনবহুল একটি দেশ। নদীমাতৃক এই দেশে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশী। ধারণা করা হয় বর্তমানে এ দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি তথাপিও আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এরপর প্রতি দিনই যোগ হচ্ছে নতুন নতুন মুখ, প্রয়োজন হচ্ছে অতিরিক্ত খাদ্যের। কৃষি বিজ্ঞানীদের বহুবিধ গবেষণা কার্যক্রম এবং বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ফলে বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন, ফসল উৎপাদনে আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তির প্রয়োগ, রোগ ও পোকামাকড়ের সুষ্ঠ দমন ব্যবস্থাপনার জন্যেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। এখন প্রয়োজন হল তা ধরে রাখা। দেশের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ সীমিত ও বিভিন্ন স্থাপনার তৈরীর জন্য কমছে প্রতিনিয়ত এবং বাড়ার আপাততঃ সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে করণীয় হলো দেশের অনাবাদী, পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনা, ফসল চাষের নিবিড়তা বাড়ানো এবং কৃষিতে বায়োটেকনোলজি প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ। জিন টান্সফার প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল-ফসলের উৎপাদন কয়েকগুণ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। যেখানে সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানভিত্তিক ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাত্র দেড় থেকে দুই গুণ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। এছাড়াও ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সকল রোগ সমূহ সবচেয়ে ক্ষতি করে থাকে এগুলোর প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা যায়। ফলে ফসল উৎপাদনে বালাইনাশকের ব্যবহার অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে। এছাড়াও আরেকটি উপায় হলো অব্যবহৃত ও অনাবাদী জমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তর করা। এদেশের জমি অনাবাদী ও পতিত থাকার কারণ দুইটি। একটি হল পানির অপ্রাপ্যতার কারণে বা খরার কারণে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না এবং দ্বিতীয়তঃ বন্যা বা অতিরিক্ত বৃষ্টি। এ সকল প্রাকৃতিক কারণগুলোকে বিজ্ঞান দ্বারা মোকাবেলা করতে হবে। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ যেমন আমেরিকা, জাপান, চীন, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়া বিরূপ আবহাওয়াকে মোকাবেলা করে খুব সহজেই ফল, শাক-সবজি ও ফুল উৎপাদন করছে।

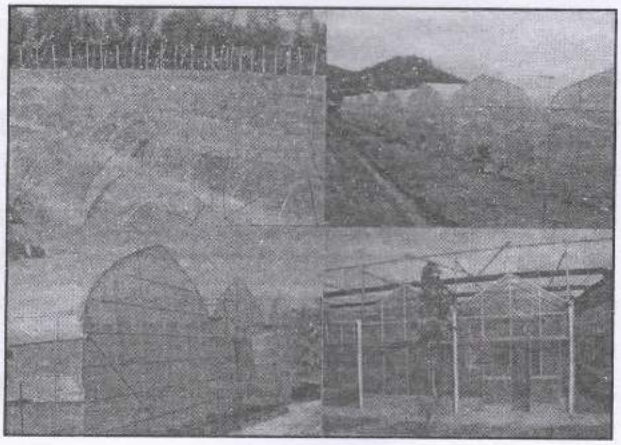

প্রোটেকটিভ হর্টিকালচার এর মাধ্যমে ফল ও শাক-সবজির উৎপাদনে তারা অনেকাংশেই সফল। দেশের প্রয়োজন ও চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা (পলিটানেল, নেটহাউজ, গ্রীণ হাউজ) তৈরি করে ফল ও শাসক-সবজির উৎপাদন করে দেশের চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে। প্রোটেকটিভ হর্টিকালচার আবার কয়েক ধরনের হয়ে থাকে যেমন- প্লাষ্টিক টানেল, গ্রীণহাউজ, চাইনিজ সোলার গ্রীণ হাউজ,

প্ল্যান্ট ফ্যাক্টরী, হাইড্রোপোনিক পদ্ধতি বা মাটিবিহীন চাষ ইত্যাদি। এ সকল পদ্ধতিতে দানাদার শস্য উৎপাদন আমাদের দেশে লাভজনক হবে না তবে বেশিরভাগ ফল ও শাক-সবজির সফল উৎপাদন সম্ভব। আগাম কৃষি সবসময় লাভজনক। সেক্ষেত্রে বরেন্দ্র অঞ্চলে এবং উচু জমিতে আগাম ফল ও সবজি চাষাবাদ করে চাষীরা অনায়াসে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন। যে সকল এলাকায় অনাবৃষ্টি বা খরার কারণে ফসল উৎপাদন সম্ভবপর হয়না সেখানে প্ল্যাষ্টিক টানেল ও চাইনিজ সোলার গ্রীণহাউজকে খুব সহজেই ফসল উৎপাদন সম্ভব। এছাড়াও গ্রীণহাউজ, প্ল্যান্ট ফ্যাক্টরী, হাইড্রোপোনিক বা মাটিবিহীন চাষ পদ্ধতিতে যে কোন স্থানে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই উচ্চ মুল্যেযুক্ত ফল, সবজি নির্বাচন করতে হবে এবং অসময়ে ফসলের উৎপাদনের উপর বেশি জোর দিতে হবে। আমাদের অনেকেরেই ধারণা মাটি ছাড়া ফসল উৎপাদন করা সম্ভব নয় কিন্তু বর্তমানে মাটি ছাড়াও বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে সফলভাবে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ফসল উৎপাদনের জন্য দরকার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের, পর্যাপ্ত আলো, বাতাস এবং পানি। মাটিবিহীন পানিতে ফসল উৎপাদনের এই কৌশলকে বলে হাইড্রোপনিক যা একটি অত্যাধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সারাবছরই সবজি ও ফল উৎপাদন করা সম্ভব। এই চাষাবাদে কোনো কীটনাশক বা আগাছানাশক কিংবা অতিরিক্ত সার দেয়ার প্রয়োজন হবে না। তাই অনায়াসে গড়ে তুলতে পারবেন অর্গানিক ফসলের সম্ভার।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সবজি বিভাগ হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সফলভাবে টমেটো, মরিচ, শিম, ফুলকপি, ব্রকলি, করলা, বামন শিম, লেটুস, শসা, ক্ষীরা এবং স্ট্রবেরী উৎপাদন করেছে। আমাদের আরেকটি ধারণাও পরিবর্তন করা দরকার। আমরা অনেকেই মনে করি ফসল উৎপাদনের জন্য জমি দরকার যেটি নাকি বাড়ি থেকে বাইরে হবে। আসলে আমাদের দেশে বাড়ির ভিতরে, বাড়ির ছাদে এবং আশেপাশের ফাঁকা জায়গায় অনায়াসেই ফসল উৎপাদন করা যাবে শুধু প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ জ্ঞান। সাধারণত দু'ভাবে হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায়। সঞ্চালন পদ্ধতি এবং সঞ্চালনবিহীন পদ্ধতি। সঞ্চালন পদ্ধতিতে গাছের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদানসমূহ যথাযথ মাত্রায় মিশ্রিত করে একটি ট্যাংকিতে নেয়া হয় এবং পাম্পের সাহায্যে পাইপের মাধ্যমে ট্রেতে পুষ্টি দ্রবণ সঞ্চালন করে ফসল উৎপাদন করা হয়। প্রতিদিন

অন্ততপক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা পাম্পের সাহায্যে এই সঞ্চালন প্রক্রিয়া চালু রাখা দরকার। এই পদ্ধতিতে প্রাথমিকভাবে প্রথম বছর ট্রে, পাম্প এবং পাইপের আনুসাঙ্গিক খরচ একটু বেশি হলেও পরবর্তী বছর থেকে শুধুমাত্র রাসায়নিক খাদ্য উপাদানের খরচ প্রয়োজন হয়। ফলে দ্বিতীয় বছর থেকে খরচ অনেকাংশে কমে যায়।

অপরদিকে, সঞ্চালনবিহীন পদ্ধতিতে একটি ট্রেতে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানসমূহ পরিমিত মাত্রায় সরবরাহ করে সরাসরি ফসল চাষ করা হয়। এই পদ্ধতিতে খাদ্য উপাদান সরবরাহের জন্য কোনো পাম্প বা পানি সঞ্চালনের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে খাদ্য উপাদান মিশ্রিত দ্রবণ ও তার উপর স্থাপিত কর্কশিটের মাঝে ২ থেকে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে। কর্কশিটের উপর ৪ থেকে ৫টি ছোট ছোট ছিদ্র করে দিতে হবে যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে এবং গাছ তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন কর্কশিটের ফাঁকা জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে পারে। ফসলের প্রকার ভেদ সাধারণত ২ থেকে ৩ বার এই খাদ্য উপাদান ট্রেতে যোগ করতে হয়। এভাবে খুব সহজেই ফসল উৎপাদন করা যাবে। হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে বাড়ির ছাদ, বারান্দা, বেলকনি এবং বারান্দার গ্রীল ব্যবহার করে বাড়ির চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজির সফলভাবে উৎপাদন সম্ভব। প্রোটেকটিভ হর্টিকালচারের আরেকটি সুবিধা হলো এখানে ফসল উৎপাদনে বিষমুক্ত শাক-সবজি পাওয়া যায়। তবে এই পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনে প্রাথমিকভাবে খরচ বেশি হলেও পরবর্তীতে লাভজনক হবে। এখানে জায়গাকে দুইভাবেই ব্যবহার করা যাবে। ভার্টিক্যাল বা উলম্বভাবে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করে জমিকে ব্যবহার করা হয় ফলে কম পরিমাণ জায়গায় অধিক পরিমাণ ফল-ফসল উৎপাদন করা যায়। বর্তমানে প্রচলিত কৃষি কর্মকান্ডে যুব সমাজের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম বা নেই বললেই চলে। কিন্তু প্রোটেকটিভ হার্টিকালচারে ফসল উৎপাদনে তারা নিজেরাই স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

এ সকল প্রযুক্তির সফল ও সুষ্ঠু প্রয়োগ দ্বারা দেশের চাষীগণ, বিভিন্ন পেশায় কর্মরত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন ঘরে বসে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করতে পারবেন তেমনি অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হবেন। বর্তমানে এদেশের মানুষ ফল এবং সবজি প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় অর্ধেক খেয়ে থাকে যা সুস্বাস্থ্যের জন্য মোটেই কাম্য নয়। কৃষিই হচ্ছে দেশের প্রধান চালিকাশক্তি। কৃষির উৎপাদন বাড়াতে প্রয়োজন দক্ষ চাষীর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মতে দেশের জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। আর এই শক্তিকে যদি কৃষি উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় তাহলে বাংলাদেশ অচিরেই উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে এটাই লেখকের আশাবাদ।

প্রবন্ধকার : উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাপাইনবাবগঞ্জ।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান

প্রকৌশলী মোঃ টিপু সুলতান

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান : বাংলাদেশে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা খাত সাধারণত দুটি উপশাখায় বিভক্ত জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা শিক্ষা। সুস্বাস্থ্য মানুষের অন্যতম প্রধান চাহিদা এবং স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ লাভ সবার মৌলিক অধিকার। সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' এ লক্ষ্যে এখনও পৌছানো সম্ভব হয় নি। তবে মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যসচেতনার কারণে স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট শাখাগুলিতে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ইতিহাস : প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যার শুরু আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে। আদিম মানুষ রোগবালাই ও অন্যান্য দুর্যোগকে স্রষ্টার অভিশাপ, শরীরে ভূতপ্রেতের অশুভ আছর বা দুষ্টগ্রহের কুপ্রভাবের ফল মনে করত। পরবর্তী কালের মানুষ চিকিৎসাবিদ্যার অনেক উন্নতি ঘটায় এবং বিভিন্ন দ্রব্যাদি রোগের নিরাময়ে ব্যবহার করে। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদ অর্থাৎ প্রাণবিজ্ঞান নাম অভিহিত। আত্রয় (প্রায় ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে), চরক সুশ্রুত ও ভগবত ছিলেন আয়ুর্বেদের বিশ্রুত বিশেষজ্ঞ। প্রথম ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও শিক্ষকরূপে পরিগণিত আত্রের বর্তমান পাকিস্তানের তক্ষশীলার বাসিন্দা ছিলেন। বর্তমানকালেও আয়ুর্বেদের অন্যতম জনপ্রিয় নাম চরক ছিলেন বৌদ্ধরাজা কণিষ্কের রাজচিকিৎসক (২০০ খ্রিস্টাব্দ)। চরকের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম চরক-সংহিতা। বারাণসীর বাসিন্দা সুশ্রুত ভারতীয় শল্যচিকিৎসার আকরগ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতা লিখেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকগণ ভগ্ন বা স্থানচ্যুত অস্থিসন্ধির চিকিৎসা, শরীরের অর্বুদ (টিউমার), হার্নিয়া ও চোখের ছানি অপসারণে দক্ষ ছিলেন।

স্বাস্থ্যসেবা : স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও গত ৪০ বছরে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা বিতরণে সমতাপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। অর্থের অভাব এবং অনুপযুক্ত চিকিৎসা সেবা সরবরাহের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৯০-১৯৯৫) স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে বলা হয়েছে 'স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যেকোন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার'। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) বলা হয়েছে 'চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সরকারের একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা'। দেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যখাতে, বিশেষত ব্যবস্থাপনা কাঠামো, সেবাপ্রদান ব্যবস্থা এবং সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। সারা বিশ্বে স্বাস্থ্য পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেও সময়ের ব্যবধানে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির চিত্র বদলে যাচ্ছে। এসব পরিবর্তনের প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ ও দেশে বিরাজমান রোগব্যাধির প্রকৃতি পরিবর্তন। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের পুনরাবির্ভাব, ডেঙ্গু, গোদ, যক্ষ্মা ইত্যাদি নতুন ও পুনরাবির্ভূত রোগের অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত। এছাড়া যৌনরোগ, এইডস জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক সংক্রামক রোগব্যাধি

ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হৃদরোগ, বৃক্কের ব্যাধি, মানসিক অসুস্থতা, ক্যানসার এবং ধূমপান ও মদ্যপানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রোগব্যাধিও বাড়ছে। বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের বর্ধিত মাত্রা জনস্বাস্থ্যের জন্য এক সম্ভাব্য বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। সম্ভবত বাংলাদেশে কিছু রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাবে এবং পুরনো রোগব্যাধি ও নতুন উদ্ভূত সংক্রামক রোগব্যাধি পাশাপাশি বিরাজ করবে। অপুষ্টি, যক্ষ্মা, প্রজনন স্বাস্থ্যের সমস্যা, উদরাময়, শ্বাসনালীর সমস্যা ইত্যাদির প্রভাব জনগণের ওপর অব্যাহত থাকবে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের পর্যালোচনা করে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, স্বাধীনতা-উত্তর ২৫ বছরে জনগণের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। গুটিবসন্ত, কলেরা ও ম্যালেরিয়া নির্মূল হয়েছে বা এগুলি অন্তত এখন আর প্রধান প্রাণহরণকারী রোগ নয়। ১৯৭০ সালে গড় আয়ু ছিল ৪৫, তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে হয় ৬০.৮। ১৯৭৫ সালে মোট জন্মহার ছিল ৬.৩, ১৯৯৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় ৩.৪। ১৯৯০-তে মৃত্যুহার ছিল ১২.০, ১৯৯৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় ৯.০ এবং তা আরও হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৯৫ সালে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় টিকাদান সম্পন্ন হয় ৬৬ শতাংশ। ১৯৯৫-তে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়ে হয় প্রতি হাজারে ৭৮। অনুরূপভাবে পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশু মৃত্যুর হার ১৯৭০ দশকে ছিল প্রতি হাজারে ২১০-এর অধিক, ১৯৯৫-তে তা নেমে আসে প্রতি হাজারে ১৩৩ জনে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি হচ্ছে প্রাথমিক সেবাপ্রাপ্তি সম্প্রসারণ এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে সেবার মান উন্নয়ন। সরকার কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক নীতিমালা (১৯৯৮ থেকে বাস্তবায়নাধীন) প্রণয়ন সাম্প্রতিককালের এক বিরাট অর্জন। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত বিষয়ক নীতিমালা প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণভিত্তিক একটি প্রক্রিয়ায়। সরকার তা অনুমোদনের পর স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ১৯৯৮-২০০০-এর মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে প্রথমবারের মতো দেশে একটি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন ও সরকার কর্তৃক তার অনুমোদন। নতুন জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি অনুসারে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত বিষয়ক নীতিমালা কাটছাট করা হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত বিষয়ক নীতিমালা ও জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের কাজ প্রায় একই সময়ে শুরু হয়েছিল বলে।

স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিবক জরিপের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে ৪১ শতাংশ মানুষ অসুস্থতার কারণে জনপ্রতি বছরে ১০ কর্মদিবস হারায়। মাথাপ্রতি বাৎসরিক চিকিৎসা খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি শহরাঞ্চলে ৯০০ টাকা, গ্রামাঞ্চলে ৬০০ টাকা। উভয় অঞ্চলে এই খরচের পরিমাণ আঞ্চলিক মাসিক দারিদ্র্য সীমারেখার সমান বা তার চেয়ে বেশি।

জন্মহার কমেছে, শিশুদের টিকাদান প্রায় ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে। ১৯৮১ থেকে ১৯৯২-এর মধ্যে চিকিৎসক জনসংখ্যার অনুপাত অর্ধেক হ্রাস পেয়ে হয় ১ : ৫২৪২ এবং ২০০০-এর শেষ নাগাদ তা দাঁড়ায় ১ : ৪৭১৯। নার্স ও জনসংখ্যার অনুপাত ১ : ৮২২৬। ২০০০ সালে নিবন্ধনকৃত চিকিৎসকের সংখ্যা ২৭,৫৪৬, নিবন্ধনকৃত নার্সের সংখ্যা ১৫,৮০৪। ২০০০ সালে হাসপাতাল শয্যার সংখ্যা ৪০,৭৯৩, তন্মধ্যে ২৯,৪০২টি সরকারি হাসপাতালের। বেসরকারি হাসপাতাল ১৩টি, সরকারি হাসপাতালের সংখ্যাও ১৩।

'স্বাস্থ্যবান বাংলাদেশের সন্ধানে: একুশ শতকের প্রত্যাশা' শিরোনামে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অপুষ্টি ও শিশুমৃত্যুর দিক থেকে বাংলাদেশের স্থান তালিকার শীর্ষে। এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং প্রধানত অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা। বাংলাদেশে ৭০ শতাংশ মা ও শিশু অপুষ্টির শিকার। প্রতিদিন ৬০০ শিশুর মৃত্যু ঘটে অপুষ্টির কারণে এবং প্রতি বছর ২৮,০০০ মায়ের মৃত্যু ঘটে গর্ভধারণসংক্রান্ত রোগব্যাধি ও জটিলতায়। বছরে ৩৩ লাখ ৩০ হাজার শিশুর জন্ম হয়, এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের (১১ লাখ ১০ হাজার) জন্মকালীন দৈহিক ওজন হয় স্বাভাবিকের চেয়ে কম। পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের দুই-তৃতীয়াংশ অপুষ্টিতে ভোগে। ছয় থেকে ৭ মাস বয়সী শিশুদের স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে না। সন্তান জন্মদানের সময় প্রতি ১০০০ প্রসূতির মধ্যে ৫ জন মারা যায়। প্রতি ৯ জনের মধ্যে ১ জন শিশু পাঁচ বছর বয়সের আগে মারা যায়। দরিদ্রতমদের মধ্যে এই হার প্রতি ৬ জনে ১ জন। শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে নিউমোনিয়া, উদরাময়, অপুষ্টি, হাম এবং জন্মের সময় ধনুষ্টংকার। দেশে পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুর সংখ্যা ২ কোটি। তন্মধ্যে ৩ লাখ ৮০ হাজার প্রতিবছর মারা যায়। এর মধ্যে নিউমোনিয়ায় ১ লাখ ২০ হাজার, উদরাময়ে ৯৫ হাজার, ধনুষ্টংকারে ১৯ হাজার ও হামে ১৫ হাজার।

স্বাস্থ্য অর্থনীতি : এটি একটি অপেক্ষাকৃত নতুন শাখা যেখানে অর্থনীতির নীতিসমূহকে প্রয়োগ করে স্বাস্থ্যখাতের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ব্যয়সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য অর্থনীতির মূলনীতিসমূহের প্রয়োগের বিষয়টি এতদিন বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ বা স্বাস্থ্য পেশাজীবীগণের নিকট খুব একটা আগ্রহের বিষয় ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমে পরিবর্তিত হচ্ছে, কারণ বাংলাদেশের লোকসংখ্যা বর্তমানে ১৬ কোটি এবং ২০৪০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা দাঁড়াবে ২৪ কোটির কাছাকাছি। কাজেই আগামী দশকগুলিতে এই বিশাল জনসংখ্যা বাংলাদেশে একটি ভয়ঙ্কর স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করবে।

বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত স্বাস্থ্য অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করার কোন নিয়মানুগ ও যথাযথ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। তাই এই অপ্রতুলতা দূর করার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৮ সালে একটি বিভাগ খুলতে উদ্যোগী হয়, যার নাম স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ। যদিও কোন কোন আন্তর্জাতিক সংস্থায়, বিশেষ করে ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্রে এই বিষয়টা নিয়ে চর্চা করা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থায় ইতোমধ্যেই এই আর্থিক খরচের বিপরীতে স্বাস্থ্যখাতে উন্নতির বিশ্লেষণের বিষয়টা দ্রুত গুরুত্ব লাভ করছে। বাণিজ্যিক সুবিধার আলোকে বিভিন্ন খাত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়েছে। (তথ্য সূত্র: বাংলাপিডিয়া।)

প্রবন্ধকার : বিভাগীয় প্রধান (ইলেকট্রিক্যাল), চুয়াডাঙ্গা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, সম্পাদক-চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞান ক্লাব।

টিউমার নিরাময়যোগ্য ব্যাধী

ডা. এস.কে.এম. রফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে মানুষের সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। আর তার সাথে সাথে বেড়েছে মানুষের বোধ। প্রতিদিন নুতন নুতন দুয়ার খুলে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানও সেক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। তবে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের পথটা খুবই দুর্বোধ্য, জটিল। জীব দেহে এর বিচরণের রাজ্য। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের রাজ্যে দেহটা মৃত বা ধাতব প্রদীপের মতো, তার অভ্যন্তরের জ্বালানি তেল মন বা হৃদয়ের মতো আর এর প্রদীপ্ত অগ্নি শিখাই জীবনিশক্তি। দেহের কোনো ঘটনায় মন যেমন আলোড়িত হয় আর মনের কোনো ঘটনায় দেহও তেমনি আলোড়িত হয়। এর ফলে সকল চক্ষুর অলক্ষ্যে জীবনী শক্তি প্রবল বা দুর্বল হয়। যেসব কারণে জীবনী শক্তি দুর্বল হতে থাকে টিউমার (Tumour) বা অর্বুদে বা অব্ তার মধ্যে অন্যতম ভয়ংকর একটি বিষয়।

প্রথমেই বলতে হয় টিউমার কী? সহজ কথায় শরীরের কোনো স্থানে আকস্মিক নিয়মিতভাবে হাড়, মাংস বৃদ্ধি পেয়ে আলু বেগুন কিম্বা বলের মতো আকার ধারণ করে (সোজা সাদামাটা কথায়) তাহাই টিউমার। এর কোনো বিশেষ আকার প্রকার বা প্রকৃতি নাই। এর উৎপত্তির কোনো বিশেষ কারণ এখনও জানা যায় নাই। তবে কোনো কোনো সময়ে আঘাতের কারণে এমন ঘটনা ঘটে থাকে বলে জানা যায়। যতদুর জানা যায় টিউমারের (Tumour) এই সূক্ষ্মতম রাজ্যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি অতো ভালোভাবে এখনো প্রবেশ করে নাই। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টির যতই আড়ালে থাকুন Tumour সৃষ্টির কারণ তবে এটাই সত্যি- টিউমার সাধারণ চোখে খুবই দৃশ্যমান। এর জীবন বিধ্বংসী ক্ষমতাও বারংবার প্রত্যক্ষ করছে সবাই।

হোমিওপ্যাথের মতে টিউমার নামের জীবন বিধ্বংসী ব্যাধি জন্ম হয় সোরা, সিফিলিস এবং সাইকোসিস দোষের কারণেই। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের এই শাখায় খুবই সূক্ষাতি সূক্ষ বিষয় বিষয় নিয়া রোগের গতিপথ অনুসরণ করে চিন্তা করেন। হোমিওপ্যাথি চিন্তকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে দেখা যায়, বিষয়টি নিবারণযোগ্য। এই প্রেক্ষিতে ডা. মহিমা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় তার ক্যান্সার গবেষণা গ্রন্থে "প্রাকটিস অফ মেডিসিন" অনুযায়ী কিছু তথ্য দান করেছেন। যে স্থলে বলা হয়েছে যে শরীরের যে কোনো স্থানে বা শারীরিক যন্ত্র একপ্রকার সৌত্রিক পদার্থ জমে তা বর্ধিত হয় ও উক্ত বর্ধন মধ্যে নানা প্রকারের অসংযুক্ত নিউক্লিয়াই ক্রমশ- বর্ধিত হতে থাকে; এর দ্বারা সিস্ফোটিক বিধান আক্রান্ত হয়ে নানা স্থানে এক প্রকার নুতন অর্বুদাদি উৎপন্ন ও সেখানে ক্ষত সৃষ্টি করে, ক্রমশ- শরীর দুর্বল করতে থাকে। এতে শরীর শুষ্ক, ক্ষয় এবং দুর্বল হয়ে এবং রক্ত সঞ্চালনে বিকৃতি সৃষ্টি করে সহজেই শরীরকে নষ্ট করে।

টিউমার প্রধানত দুই প্রকৃতির হয়। প্রথমত: মেলিগন্যান্ট (Malignent) বা দুষ্ট টিউমার। দ্বিতীয়ত: বিনাইন বা নির্দোষ টিউমার।

আকার প্রকার ইত্যাদি থেকে এই দুইটি টিউমারকে পৃথক করা হয়ে থাকে। এই দুইটিকেই টাইটিক্যাল অথবা এ্যাটাইপিক্যাল টিউমার বলা হয়ে থাকে। তাদের Hestological জীবদেহের তন্তু বিষয়ক এবং Cytological জীব কোষ নিয়ে কাজের চরিত্র অনুযায়ী।

১। শিষ্ট টিউমার (Benign Tumour) জীবনকে বিপর্যস্ত করেনা এবং কোনোরূপ অসুস্থতা অথবা জীবনী শক্তি কমিয়ে দেবার কারণ সৃষ্টি করেনা। কিন্তু জীবদেহের তন্তুবিদ্যা বিষয়ক বিচারে নির্দোষ টিউমার অনেক সময় ক্ষতিকর হতে পারে। তাদের দ্রুত বৃদ্ধির দ্বারা অথবা বারবার অপারেশন দ্বারা তুলে ফেলা নির্দোষ টিউমার যতক্ষণ না কোনো গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের উপর ইচ্ছে এবং তার ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে ততক্ষণ জীবনের কোনো ক্ষতি সাধন করেনা। এরা খুবই ধীরগতিতে বৃদ্ধি পায় এবং একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় পৌঁছে স্থায়ীভাবে থেকে যেতে পারে। এর দুষ্ট টিউমারের মত স্থানান্তরিত হয়না। সে সচরাচর খারাপ বা পচনকারী অবস্থার সৃষ্টি করেনা। তবু টিউমার শতর্কতা আবশ্যক কারণ তাদের সুনির্দিষ্টভাবে পৃথকীকরণের কোনো সুনিশ্চিত চিহ্নিত করণের কোনো উপায় নাই। অতএব মনেই রাখতে হবে ক্ষতি করার ক্ষমতাও এর আছে।

২। দুষ্ট বা (Malignant Tumour) এই টিউমারগুলি প্রকৃতপক্ষেই দুষ্ট-নষ্ট বলতে যা বুঝায় তাই। দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এর মধ্যে তরল পদার্থ সঞ্চিত হয়। পরিব্যাপ্ত হয় এবং সুস্থ্য টিস্যুসমূহে প্রসারিত হয় সর্বদাই দেহের ক্ষতিকরণ পূর্বক দূরবর্তী যন্ত্রসমূহে আক্রমণ করে ও ক্ষতি সাধন করে মৃত্যু ঘটায়। সাধারণ ম্যালিগনেন্ট টিউমার সমূহ সর্কোমা (Sarcoma), কার্সিনোমা (Carcinoma) এবং মেলিগন্যান্ট মেলানোমা সমূহ (Malignant Melanoma)। ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের সংজ্ঞার কথা বললে বলবো- সেই টিউমারগুলিই মেলিগন্যান্ট টিউমার যেগুলো অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশঃ নিফিসট্রেশন বা তরল পদার্থ সঞ্চিত পদ্ধতির দ্বারা বৃদ্ধি পেতে থাকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং পার্শ্ববর্তী টিস্যুসমূহকে আক্রমণ করে।

১। এগুলি একটি নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ থাকে না এবং পার্শ্ববর্তী টিস্যুসমূহের মধ্যেও একে সীমাবদ্ধ করা যায়না।

২। এর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আক্রান্ত স্থান থেকে দূরবর্তী স্থানসমূহে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

৩। স্থানীয় টিউমারগুলিকে তুলে ফেললেও পুনরায় সেই স্থানে বা পার্শ্ববর্তী স্থানে টিউমার উৎপন্ন হইতে পারে।

৪। এগুলির অবনতির দিকে অত্যন্ত প্রবণতা দেখা যায়- যখন বিনাইন গ্রোসের সঙ্গে বা নির্দোষ বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা হয় প্রায় এনিমিয়া এবং ক্যাক্কেসিয়া বিশেষত: কর্মিনোমাতে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী শিশু এবং মহিলাদের শরীরেই টিউমার হারে বেশি হতে দেখা যায়। যে কোন বয়সে, যে কোন শরীরে যেখানেই টিউমার হউক না কেন তা জীবের জীবনী শক্তিতে প্রভাব ফেলতে পারে। কোন যন্ত্রণার উদ্রেগ না করলেই যে তার চিকিৎসার প্রয়োজন নাই একথা ভাবা ঠিক নয়। আবার চিকিৎসার নামে অপ-বিজ্ঞান বা অবিজ্ঞানের আশ্রয় নেওয়াও একান্ত অনুচিৎ। হোমিও প্যাথও একটি বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা নিলে সহযেই দুর্ধর্ষ টিউমারের নিরাময়যোগ্য চিকিৎসা করা সম্ভব। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান আজ এক বিশ্বয়কর অবস্থানে এসে পৌঁছে গেছে। যার বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসায় আজ পৃথিবীর সব মানুষ টিউমার মুক্ত হওয়ার দাবি করতে পারে। যদিও টিউমার ক্যান্সার রোগের জননী বলেই পরিচিত। সুন্দর সাবলীল স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় টিউমার আজ নিরাময়যোগ্য একটি রোগ।

প্রবন্ধকার : ডাক্তার, খেয়া হোমিও প্যাথ, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

খাদ্যের উৎস, জীবনের উৎস গাছ

কৃষিবিদ আলী আকবর

গাছ হচ্ছে খাদ্য, আশ্রয়, পুষ্টি ও জীব বৈচিত্রের আধার, রোগমুক্তির আকর। একটি গাছ বছরে ২৬ পাউন্ড কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং ত্যাগ করে এমন অক্সিজেন যা এক বছরে ৪ জনের পরিবারের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যথেষ্ট, এক হেক্টর বন প্রায় ৪ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড টেনে নেয় ও ২ টন অক্সিজেন ছেড়ে দেয়।

ভারতের দেরাদূন ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের এক তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, ৫০ বছরের একট গাছ ৩৫ লক্ষ টাকার মূল্যের সম্পদ, উপকরণ ও উপাদান দিয়ে থাকে। বনজ ওষধি বৃক্ষ হচ্ছে পৃথিবীর অর্ধেক স্বীকৃত ঔষধের উৎস যার মূল্য ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর আমাদের ওষধি বৃক্ষ জগত বিখ্যাত।

কোন বিকট শব্দ বা হর্ণ বাজার সাথে সাথে গাছ অধিকাংশ শব্দ শোষন করে পরিবেশকে শব্দ দূষণ থেকে বাঁচায়। একটি পূর্ণ বয়স্ক আম বা কাঁঠাল গাছ গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে ১০০ গ্যালনের মত পানি ১৪০০ বর্গফুট পাতার ক্যানোপির (চাঁদোয়া) মাধ্যমে বাষ্পীভূত করে বাতাসে ছেড়ে দেয়।

একটি বৃক্ষের উপকারিতা

একটি গাছ যদি ৫০ বছর বাঁচে তাহলে তার কাঠ, ফল, ফুল ছাড়াও আর যা যা পাওয়া যায় তার মূল্য নিরূপন:

- ৫০ বছরের একটি বড় গাছ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের অক্সিজেন দেয়।
- জীবজন্তুর খাদ্য জোগায় ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত।
- মাটির ক্ষয় ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার। রাতের আর্দ্রতা বাড়িয়ে বৃষ্টিপাতের অনুকূল অবস্থা তৈরী করে বাঁচায় প্রায় ৩ লক্ষ টাকা।
- বায়ুদূষণ থেকে আমাদের রক্ষা করে সাশ্রয় করে ৫ লক্ষ টাকা। পাখি, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি গাছনির্ভর প্রাণীর আশ্রয়-মূল্য হিসেবে ৫০ বছরে গাছের দাম প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

সুন্দরবনের বিবরণ

সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার বিশাল অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত। এ বনভূমি বাংলাদেশের ও বিশ্বের অন্যতম গরান বৃক্ষের বনভূমি। সুন্দরবনের আয়তন ৬৭৮৬ বর্গ কিঃমিঃ। তন্মধ্যে ৬৭২৪ বর্গ কিঃমিঃ সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ অংশ নিয়ে এ বনভূমি অবস্থিত। অবশিষ্ট ৬২ বর্গ কিঃমিঃ বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত। সুন্দরবন সমুদ্র উপকূল হতে উত্তরের দিকে প্রায় ১২৩ কিঃমিঃ এর পূর্বে-পশ্চিমে প্রায় ১৬০ কিঃমিঃ পর্যন্ত প্রসারিত।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে সুন্দরবন গড়ে ওঠার কারণ হল বিভিন্ন নদীর মোহনায় অবস্থিত। বালি ও কাদার বিভিন্ন স্তরে গঠিত নদীবাহিত উর্বর পলল মৃত্তিকা, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ও লোনা পানি, পরিমিত উত্তাপ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত, স্বল্প জনবসতি ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি। সুন্দরবন নাম করনের পিছনে বেশ কিছু মতবাদ রয়েছে। যেমন অনেকে মনে করেন সুন্দরবন দেখতে খুবই সুন্দর। যার ফলে এ বনের নামকরণ হয়েছে সুন্দরবন। আবার অনেকে মনে করেন এ বনে সুন্দরী বৃক্ষের সমাবেশ রয়েছে যার জন্য নামকরণ হয়েছে সুন্দরবন। আবার অনেকের ধারণা যে এ বনভূমি সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত বলে খুবই সুন্দর দেখায়, এ জন্য এর নামকরণ করা হয়েছে সুন্দরবন।

বেড়ায় খেতের ফসল খায় ঃ বৃক্ষ নিধন ও বনাঞ্চল উজাড়ের খবর প্রায়শঃই পত্র-পত্রিকায় চোখে পড়ে। প্রকাশিত খবরে বলা হয় যে, নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে কোটি কোটি টাকার কাঠ ও বাঁশ অবৈধভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে। সরকার ইতঃপূর্বে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও বনজ সম্পদ রক্ষার্থে গাছ কাটা নিষিদ্ধ করেছেন। তবে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিছু শিথিল রাখা হয়েছে।

সরকারের এ শিথিলতার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণির অবাঞ্চিত অসাধু ব্যবসায়ী এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কিছুসংখ্যক দুর্নীতিপরায়ন কর্মকর্তা-কর্মচারী দেশের বনজ সম্পদ উজাড় করে চলেছে এবং সারাদেশের বনাঞ্চলকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে যে মুহূর্তে বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্ব সোচ্চার সে মুহূর্তে এমন খবর আমাদের জন্য ভীষণ উদ্বেগের কারণ। জানি না অবাধে গাছ কাটার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সরকার তা কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। দেশের সুস্থ, সুন্দর পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের প্রায় ৫ হাজার বর্গমাইল এলাকা বনাঞ্চল বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। এ বনাঞ্চল দেশের মোট জমির ৭ ভাগ মাত্র। দেশে বনভূমির পরিমাণ থাকার কথা ২৫ ভাগ, কিন্তু আমাদের তা নেই।

উপরন্তু এ ৭ ভাগ বনাঞ্চল থেকে নির্দয়ভাবে বৃক্ষ নিধন করা হচ্ছে। যেভাবে বৃক্ষ নিধন ও বনাঞ্চল উজাড়ের খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে বনাঞ্চলের পরিমাণ ৭ ভাগ আছে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানো ছাড়াও বৃক্ষ ও দেশের প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক পরিবেশকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। বনভূমি বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে এবং বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি হতে প্রাণীকূলকে রক্ষা করে। পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃক্ষ ও বনাঞ্চলের অভাবে প্রায় প্রতি বছরই আমাদেরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হতে হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বনাঞ্চল সম্প্রসারণ করা ছাড়া কোন গতি নেই। আর যদি থেকেও থাকে তাহলে সেটা আমাদের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ বনজ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণের উপরই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভর করে। ক'দিন আগে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার খবরে জানা যায়, সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এলাকার সংরক্ষিত বনাঞ্চল

হতে বন বিভাগের কিছুসংখ্যক অসৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় কাঠ ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্য দিবালোকে কাঠ কেটে বিভিন্ন বাজারে অবাধে বিক্রি করছে।

চোরাই কাঠের বেশীর ভাগই অবৈধভাবে বসানো স'মিলগুলোতে জড়ো করে তা করাতকলের মাধ্যমে সাইজ করে সড়ক ও নদীপথ দিয়ে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে বিক্রি করা হয়। বন বিভাগের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে কোন কোন দিন ৪-৫ লাখ টাকার কাঠ কাটা হয় বলেও খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সিলেট অঞ্চলের বনাঞ্চল সংকুচিত হয়ে আসছে এবং এভাবে চলতে থাকলে সিলেট বিভাগের বনভূমির অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। শুধু সিলেট কেন, দেশের প্রতিটি বনাঞ্চলে যেভাবে অবাধে গাছ কাটা চলছে তাতে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা তো দূরের কথা গ্রামে-গঞ্জেও ওষুধের জন্য প্রয়োজনীয় গাছ-গাছড়া পাওয়া যাবে কিনা-সন্দেহ। এক তথ্যে জানা যায়, সিলেট বিভাগে এক হাজারের মত স'মিল রয়েছে যার বেশীর ভাগই অবৈধ, কোন কাগজপত্র নেই। এছাড়া প্রতিবিদন নতুন নতুন স'মিল গজিয়ে উঠছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সরকারের স'মিল লাইসেন্স বিধিমালা ১৯৯৮-এ(১) ধারায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, সংরক্ষিত, রক্ষিত, অর্পিত ও অন্য যে কোন ধরনের সরকারী বনভূমির সীমানার ১০ কিলোমিটারের মধ্যে কোন স'মিল স্থাপন ও পরিচালনা করা যাবে না (পৌর এলাকা ছাড়া)। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সিলেট বিভাগের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে দেখা যায়, সরকারের এ বিধিমালা লংঘন করে একশ্রেণীর প্রভাবশালী সংঘবদ্ধ চোরাই কাঠ ব্যবসায়ী বন বিভাগের কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে সরকারের অধ্যাদেশের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে অহরহ নতুন নতুন স'মিল বসিয়ে চলেছে। সূত্র মতে, অবৈধ এসব স'মিল থেকে বন বিভাগের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য এজেন্সীর লোকজন মোটা অংকের মাসোহারা পেয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। মরুর দেশগুলোতেও আজ প্রচুর বৃক্ষচারা রোপন করা হচ্ছে। বনাঞ্চল সৃষ্টির প্রয়াস চলছে অব্যাহত গতিতে। আর তার বিপরীত অত্যধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত আমাদের দেশে বৃক্ষ নিধন করে বনভূমি উজাড় করা হচ্ছে।

মানুষের বসবাসের জন্য যেমন বাড়ী-ঘরের প্রয়োজন পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যও বনভূমির প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের প্রয়োজনে বহু অরণ্য বৃক্ষহীন হয়ে পড়লেও তারা আজ বনাঞ্চল সম্প্রকারণ ও সংরক্ষণের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। আমরা জানি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহন করে তার বিনিময়ে অক্সিজেন সরবরাহ না করলে এ পৃথিবীতে মানুষ গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, পশু-পাখি কিছুই থাকবে না। বিরান হবে সারা পৃথিবী। আমাদের দেশে গাছপালার অভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিরূপ ও তৈরী হয়ে উঠছে। এ অবস্থা মোকাবিলা করতে আমাদের অবশ্যই যেখানে সম্ভব গাছের চারা রোপণ করতে হবে। আমাদের অফিস-আদালত, কল-কারখানা, রেল ও সড়ক পথের উভয় পাশে, বেড়িবাঁধে, বসতবাড়ির আঙ্গিনায়, সরকারী খাস জমিতে এবং চা বাগানের অনাবাদী ভূমিতে বৃক্ষরোপণ করে বনাঞ্চল সৃষ্টির প্রয়াস চালাতে হবে। আমরা যদি তা না করি তাহলে শূন্যতার সৃষ্টি হবে, বনাঞ্চলের নিবিড়তা কমবে,

সারাদেশে ধু-ধু প্রান্তরে পরিণত হবে। পাশাপাশি বন বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের দুর্নীতি পরায়ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোরভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

বক্তার মুখে সস্তা বুলি
বাঁচাও পরিবেশ
ইটের ভাটা করাতকলে
বৃক্ষ হল শেষ।
পরিবেশের নীতি কথা
দেশ জনতার স্বার্থ
পরিবেশের মূল হচ্ছে নির্মূল
মূলে তার অর্থ।
কাকে আমি মানুষ বলি
কাকে বলি জোঁক
বৃক্ষ কাটে বৃক্ষ বেচে
অর্থলিপ্সু বনবিভাগের লোক

প্রবন্ধকার : অধ্যক্ষ (অব.) মনোয়ারা মঞ্জিল, ধর্মপুর পূর্ব চৌমুহনী, কুমিল্লা।

বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন ও নিরাপদ খাদ্য

শহিদুল ইসলাম

ভূমিকা ঃ নদী নালা বিধৌত সমভূমি, পহাড়-পর্বত আর অরণ্য ভূমি নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের ভূ প্রকৃতি। পদ্মা, মেঘন, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র. কর্ণফুলি, তিস্তা, মধুমতি, প্রভৃতি অনেক নদী উপনদী ও তাদের শাখা প্রশাখা প্রবাহিত হয়েছে এ দেশের উপর দিয়ে। এসব নদী উপনদী অববাহিকায় অঞ্চল গঠিত হয়েছে উত্তম কৃষিজমির উপযোগী পলিমাটি দ্বারা। বাংলাদেশের ভূখন্ডকে প্রাচীন কালে বেঙ্গল বেসিন (Bengal Basin) বলা হয়। বাংলাদেশের জনগণ খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। বিপুল জনসংখ্যার এই দেশের মানুষের মুখে খাদ্য সরবরাহ করতে হলে কৃষির উন্নয়ন অপরিহার্য। কৃষিজাত পণ্য ঠিকমত উৎপন্নের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তাছাড়া পুষ্টি সমস্যা সমাধানের জন্য শাকসবজি, ফল, মূল, মাছ, ডিম, দুধ, ইত্যাদির বিকল্প নেই। তাই জমিতে উৎপাদিত খাদ্য শষ্যকে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষনের উপর গুরত্ব আরোগ করতে হবে। তাছাড়া বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন ও নিরাপদ খাদ্যের জন্য আমাদেরকে আরও সতর্কতার সাথে এগিয়ে চলতে হবে।

শস্য সংরক্ষনের ধারনা ঃ জমিতে উৎপাদিত বা গুদামে সংরক্ষিত কৃষি পণ্য পোকা, রোগ, আগাছা এবং ফসলের অন্যান্য শত্রু থেকে রক্ষা করাকে শস্য সংরক্ষণ বলে। কৃষকের উৎপাদিত ফসল পোকামাকড়, রোগবালাই, আগাছা, ইদুঁর ইত্যাদি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আগাছার ক্ষতিকারক প্রকারসমূহ ঃ (Harmful Effects of weed) :

(ক) খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি সৃষ্টি হয়।

(খ) স্থানের পরিমাণ হ্রাস পায়।

(গ) আলো বাতাসের অপর্যাপ্ততা সৃষ্টি করে।

(ঘ) পানির স্বল্পতা সৃষ্টি হয়।

(ঙ) ফলন হ্রাস পায়।

(চ) উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়।

(ছ) উৎপাদিত পণ্যের মূল্য কম হয়।

(জ) পোকা ও রোগের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে ঃ অধিকাংশ আগাছা ফসল বিহীন মৌসুমে পোকামাকড় ও রোগের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। যেমন- বরবটি গাছ থেকে গমের আলগা ঝুল রোগের ছত্রাক এসে থাকে। ধানের মাজরা বা পামরী পোকা, তুলার গান্ধি পোকা প্রভৃতি বিভিন্ন আগাছা বাস করে এবং উপযুক্ত সময়ে ফসলে এসে আক্রমণ করে।

(ঝ) আগাছার বিষাক্ত প্রভাবঃ অনেক সময় দেখা যায় যে, আগাছার বিষাক্ত প্রভাবের ফলে মূল ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তুলা ক্ষেতে দূর্বা জাতীয় আগাছা জমিলে এদের দ্বারা নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা তুলা গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বন রসুন, বন পিয়াজ প্রভৃতি আগাছা খাওয়ার ফলে গবাদী পশুর দুধে দূর্গন্ধ হয়। অপরদিকে লিউপিন, ক্লোভার, কচি বজরা প্রভৃতি আগাছা খাওয়ার ফলে গবাদী পশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে দেখা যায়।

আগাছা দমন পদ্ধতি (Weed Control Methods) ঃ

(১) আগাছা প্রতিরোধ ঃ

(ক) বীজ ধারন করার পূর্বেই আগাছা বিনষ্ট করে দিতে হয়।

(খ) পরিষ্কার বীজ ব্যবহার করতে হবে।

(গ) আগাছা বীজমুক্ত জৈব সার জমিতে ব্যবহার করতে হবে।

(ঘ) ফসল মাড়াইয়ের স্থানে যাতে কোন আগাছার বীজ না থাকে তা সতর্কতার সাথে দেখতে হবে।

(ঙ) বীজতলা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

(চ) পানি সেচের নালা ও জমির আশপাশগুলো সর্বদা আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

(২) আগাছার দমন ব্যবস্থা (Control Measures) ঃ

জমিতে আগাছা জমিলে তার উচ্ছেদ সাধনই আগাছা দমনের মূল উদ্দেশ্য। আগাছা দমন বলতে আগাছা নির্মূলকরণ বোঝায় না। আগাছা দমনের মূল উদ্দেশ্য হল আগাছার সংখ্যা এমনভাবে হ্রাস করতে হবে যাতে শস্য ফসলের কোনরূপ ক্ষতি না হয়। আগাছা দমন পদ্ধতিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(১) পরিচর্যা পদ্ধতি (Cultural Method)

(২) যান্ত্রিক পদ্ধতি (Mechanical Method)

(৩) রাসায়নিক পদ্ধতি (Chemical Method)

(১) পরিচর্যা পদ্ধতি (Cultural Method) ঃ

(ক) আবৃত ফসলের চাষ (Cultivation of cover corps) ঃ জমিতে যদি এমন সব ফসল চাষ করা হয় যারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র জমি আবৃত করে ফেলে (কলাই, বরবটি, মটর, তবে আগাছা তেমন বিস্তার লাভ করতে পারে না।

(খ) শস্য পর্যায় (Crop rotation) ঃ শস্য পর্যায় অবলম্বনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসল পর্যায়ক্রমে চাষ করলে ঐ বিশেষ আগাছা উপযুক্ত পরিবেশ না পেয়ে মরে যায়।

(গ) বীজ বপনের হার ও বপনের তারিখ পরিবর্তন ঃ বীজ বপনের তারিখ পরিবর্তন করে জমিতে বারংবার কর্ষণ করলে অঙ্কুরিত আগাছা সমূলে বিনষ্ট হয়।

(ঘ) ক্যাচ ক্রপি (Catch Cropping) ঃ দুটি প্রধান ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে একটি স্বল্পকাল স্থায়ী ফসলের চাষ করিলে আগাছা জমিতে সুযোগ পায় না।

(ঙ) সম্পূর্ণ পতিত বা অর্ধপতিত ও শস্য পর্যায় পদ্ধতি ঃ সম্পূর্ণ পতিত এবং অর্ধপতিত বেলে জমিকে বার বার কর্ষণ করে কেবলমাত্র একটি স্বল্পকাল স্থায়ী শস্য চাষ করে আগাছা নির্মূল করা যায়।

(২) যান্ত্রিক পদ্ধতি (Mechanical Method) ঃ

(ক) হাত দিয়ে তুলে ফেলে

(খ) বাব বার কর্ষণ করলে

(গ) কোদাল, খুরানি, নিড়ানি, কালস্টিভের, হুইলহো যন্ত্রের সাহায্যে নিড়ানী দিয়ে আগাছা দমন করা যায়।

(ঘ) জমিতে কাদা করে

(ঙ) পুড়িয়ে

(চ) আবৃত করে

(ছ) ঘাস কাটা যন্ত্রের সাহায্যে কেটে আগাছা দমন করা যায়

(৩) রাসায়নিক দমন (Chemical Control) ঃ বর্তমান যুগে আগাছা দমনের একটি পদ্ধতি। কতকগুলো আগাছা নাশক ওষুধ এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। আগাছাগুলো জন্মানোর পূর্বে নির্দিষ্ট জমিতে ও আগাছা জন্মানোর পরে আগাছার উপরে ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। আগাছা নাশক ওষুধগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ-

(ক) নির্বাচিত আগাছা নাশক ওষুধ।

(খ) অনির্বাচিত আগাছা নাশক ওষুধ।

(ক) নির্বাচিত আগাছা নামক ওষুধ ঃ এ জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করলে বিশেষ বিশেষ প্রজাতির আগাছার ক্ষতি হয় এবং পরে ঐ জাতীয় উদ্ভিদ মারা যায়। বর্তমান আগাছা বিনাশের জন্য আগাছা নামক ওষুধ প্রয়োগ করাই উত্তম ও নির্ভরযোগ্য উপায়। কারণ রাসায়নিক পদ্ধতি দ্বারা আগাছা নিয়ন্ত্রন সময় মত করা যায় এবং যে সকল স্থানে শ্রমিক ও যন্ত্রের অভাব থাকে সেখানে রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে অতি অতি সহজেই আগাছা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এ পদ্ধতি অনেক সহজ, সময় ও খরচ খুব কম লাগে। রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ সব প্রজাতির উদ্ভিদের ক্ষতি হয় না। ওষুধ উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসলে বা উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করলে উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটে। M.C. P.A, 2, 4-D, Stem, F-34 ইত্যাদি আগাছা নাশক ওষুধ। যার ব্যবহারের ফলে শস্যে বিষ থাকতে পারে।

(খ) অনির্বাচিত আগাছা নাশক ওষুধ ঃ এ জাতীয় ওষুধ উদ্ভিদের পত্র, মূল, কান্ড ইত্যাদি যে কোন স্থানেই প্রয়োগ করা হোক না কেন এরা সকল আগাছাকে ধ্বংস করে। আগাছা বীজের অঙ্কুরোদগমের আগে এগুলোকে মাটিতে প্রয়োগ করলে বীজ নষ্ট হয়ে যায়। পতিত জমিতে আগাছা দমনের জন্য বা বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পূর্বে

এ জাতীয় ওষুধ মাটিতে প্রয়োগ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ সোডিয়াম ক্লোরেট, কার্বন ডাইঅক্সাইড, বোরন যৌগ, মিথাইল বোমাইড এর নাম উল্লেখ করা যায়। যার ব্যবহারে ক্ষেতে বিষ থাকতে পারে।

পোকা মাকড়ের ক্ষতিকর দিক ঃ ফসলের ক্ষতিকর গুরুত্বপূর্ণ কতগুলে পোকার ক্ষতির ধরন ও তাদের দমন পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

ধানের মাজরা পোকা, পামরী পোকা, গান্ধি পোকা ক্ষতিকর পোকা হিসেবে চিহ্নিত।

মাজরা পোকা ঃ ডাইমেক্রন ১০০ ইসি বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি, ওষুধ এর যে কোন একটি ২-৩ কেজি ৪৫০ লিটার পানিতে মিশিয়ে এক এক হেক্টর জমিতে স্প্রে করলে মাজরা পোকা মারা যায়। যার মাধ্যমে শস্যে বিষ থাকতে পারে।

পামরী পোকাঃ সুমিমিয়ন-৫০, লেবসিড-৫০ ইত্যাদি ওষুধের ১ লিটার পরিমাণ ৪৫০-৫০০ লিঃ পানিতে মিশিয়ে এক হেক্টর জমিতে প্রয়োগ করতে ভাল ফল পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে শস্যে বিষ থাকতে পারে।

গান্ধি পোকা ঃ ৫০ গ্যালন পানিতে ৪০৪ সি.সি ম্যালাথিয়ন, ফাইফানন সুমিথিয়ন যে কোন একটি কীটনাশক মিশ্রিত করে এক একর জমিতে স্প্রে করলে এ পোকা দমন রোধ করা যায়। যার মাধ্যমে শস্যে বিষ থাকতে পারে।

সরিষার জাব পোকা ঃ জাব পোকা আক্রমন করলে সরিষার উৎপাদন ব্যাহত হয়। পাতা কুচকে যায়, গাছ শুকিয়ে যায়, গাছে ফল ধরা কমে যায়। ফুল ঝরে যায়। এই পোকার আক্রমন থেকে বাঁচতে হলে ডায়াজিনন ৬০ ই সি বা নগজ ১০০ ই সি এর ৪.৫ মি. লিটার ৪-৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে জমিতে সিঞ্চন করলে পোকা দমন করা যায়। যার ব্যবহারে শস্যে বিষ থাকতে পারে।

গোল আলুর সুতলী পোকা ঃ আলু ক্ষেত এবং সংরক্ষণাগারে এ পোকার আক্রমন দেখা যায়। আলু ছিদ্র করে এবং ছত্রাকের আক্রমনে আলু পচে যায়। বীজ অবস্থায় সেটি নষ্ট হয়ে যায়। ৫০ গ্যালন পানিতে ৪৫৫ মিলিগ্রাম ডায়াজিনন, সুমিমিয়ন, বাইড্রিন ইত্যাদির কোন একটি মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে আলুতে বিষ থাকতে পারে।

রোগ বালাই ঃ উদ্ভিদ দেহের বা দেহের যে কোন অংশের বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীন যে কোন প্রকারের অস্বাভাবিক ভাবে রোগ বলে। বিভিন্ন কারণে উদ্ভিদের রোগ হয়ে থাকে। যেমনঃ ছত্রাক, নেমাটোড, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস। তাছাড়া পুষ্টি উপাদানের অভাব বা আধিক্য জনিত কারনেও রোগ হতে পারে। উদ্ভিদ রোগের কারণস্থলের মধ্যে ছত্রাকই হল সর্বপ্রধান। রোগের বিশিষ্ট লক্ষন অনুযায়ী রোগকে ৭ ভাগে ভাগ করা হয় যায়। যথাঃ- (১) পাতায় দাগ রোগ। (২) মরিচা রোগ। (৩) নরম পঁচা রোগ। (৪) ঢলে পড়া রোগ। (৫) গোড়া বা ব্লাইট রোগ। (৬) নেতিয়ে পড়া রোগ এবং (৭) ঝুল রোগ।

উৎস ভিত্তিক রোগের শ্রেণিবিভাজন ঃ উৎসস্থলের ওপর ভিত্তি করে রোগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা- (১) মৃত্তিকা বাহিত রোগ (২) বায়ু বাহিত রোগ এবং (৩) বীজ বাহিত রোগ ।

ধানের বাদামী দাগ রোগ, উফরা দাগপড়া রোগ, টুংরো ভাইরাস রোগ, গমের মরিচা বা রাষ্ট্ররোগ, ঝুল রোগ, গোল আলুর মড়ক বা নাভী ধ্বসা বা বিলম্ব ধ্বসা রোগ, কলার পানামা রোগ প্রভৃতি। বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে

এসব রোগের হাত থেকে ফসলকে বাচান সম্ভব। যেমন ধানের বাদামী দাবা রোগ দেখা দিলে সাথে সাথে ছত্রাক নামক ওষুধ যেমন ডাইথেন এস-৪৫ বর্দোনিশ্রার সাহায্যে স্প্রে করলে ভাল ফলদায়ক ভূমিকা পালন করে। যার মাধ্যমে শষ্য বিষ থাকতে পারে।

ইঁদুরের আক্রমন ঃ ইঁদুর ফসল এবং মানুষের বড় শত্রু। এরা মাছ, গোশত, সাবান, পোকা, ধান. গম ইত্যাদি খায়। এরা টাইফয়েড, প্লেগ, আমাশয়সহ ৩০ প্রকারের মারাত্মক রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। ইঁদুরের গর্ত, পায়ের চিহ্ন ও চলাচলের রাস্তা, পায়খানা, ক্ষতিকর চিহ্ন, চলার শব্দ ও বাসা দেখে ইঁদুরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তীব্র বিষ জিংক ফসফাইড এবং দীর্ঘস্থায়ী বিষ রেকুমিন এর মাধ্যমে বিষটোপ তৈরি করে প্রয়োগ করতে হয়। এ বিষের প্রভাব উৎপাদিত শস্যের ভিতরও থাকতে পারে।

আগাছা, পোকামাকড়, রোগবালাই, ইঁদুর দমনের কারণে যে সব কীটনাশক ঔষুধ ব্যবহার করা যার তা ফসলের জন্য ক্ষনিকের জন্য উপকার হলেও বৃহৎ স্বার্থে তার ফলাফল হতাশা ব্যঞ্জক। কারণ বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন আমাদের জীবনে স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। সমন্বিত নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা বা I.P.M বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচারিত বালাই দমন ব্যবস্থা। সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল পরিবেশের ক্ষতি না করে সফল ভাবে বালাই নিয়ন্ত্রন করা। বিষমুক্ত ফসল উৎপাদনের জন্য সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি (I P M) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে এনে ফসলকে বিষমুক্ত করা যায়। নিম্নে চিত্রে মাধ্যমে সেটা উপস্থাপনা করা হলঃ-

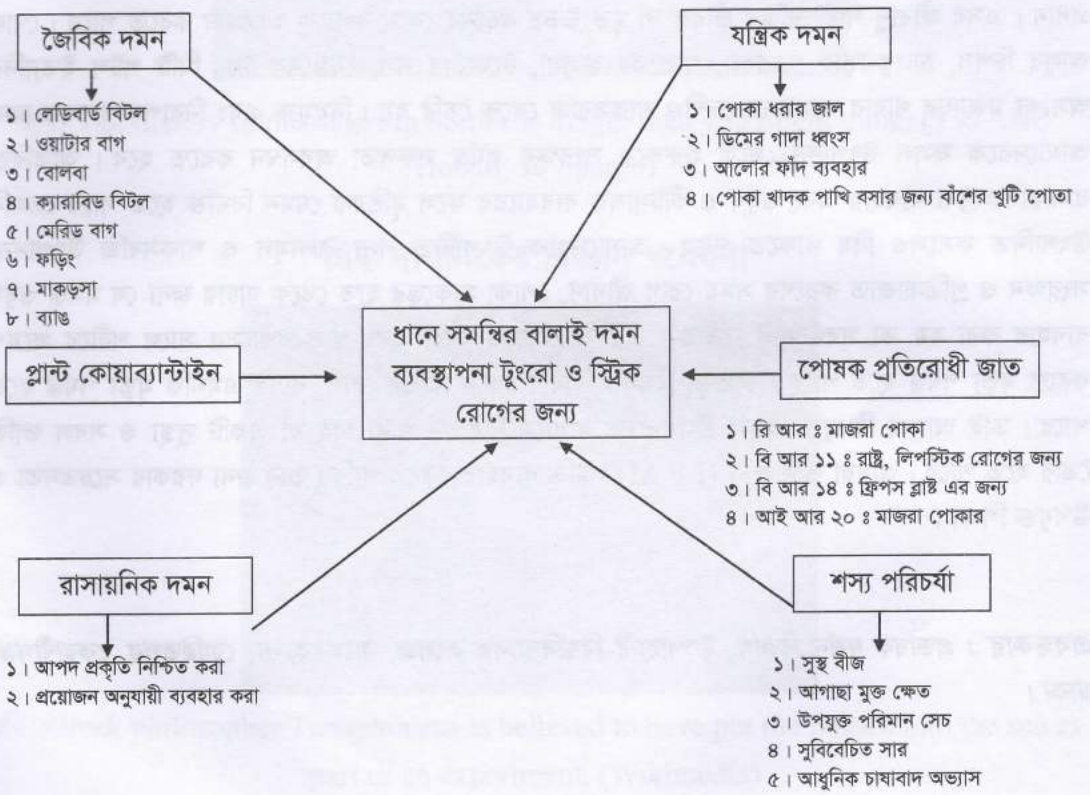

চিত্রঃ বাংলাদেশে ধানের সমন্বিত বালাই দমন ব্যবহার (I P M) কার্যক্রম (DAE/FAO)।

খাদ্য শষ্য, ফলমূল, এবং শাকসবজি সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করণ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। ফলমূলকে বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা যায়। যথাঃ-

(১) তাপ প্রয়োগের সহায্যে সংরক্ষণ (আম, আনারস)

(২) রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে সংরক্ষণ (আনারস, পেয়ারা)

(৩) অতিরিক্ত চিনি ব্যবহার করে সংরক্ষণ (আনারস, আম)

(৪) অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার করে সংরক্ষণ (লেবু,শসা)

(৫) জৈব অম্লের সাহায্যে সংরক্ষণ (আমড়া, কুল,আম)

(৬) তেল ব্যবহার করে সংরক্ষণ (আম, জলপাই, কুল, লেবু)

তাছাড়া পেয়ারা, জেলি, মোরব্বা, চাটনি তৈরীর সময় সতর্কতা অবলম্বন করা ভাল। শাকসবজি রোগ জীবাণু আক্রমন করে পঁচন সৃষ্টি করতে পারে। এ সমস্ত জীবাণুর মধ্যে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া দায়ী। ছত্রাকগুলোর মধ্যে অল্টারনেরিয়া (Alternaria) বট্রাইটিস (Botryties) রাইজোপাস (Raizopus) ও পেনিসিলিয়াম (Penceillium) ব্যাকটোরিয়ার মধ্যে ইরউইনিয়া (Eruinia) ও সিউডোমোনোসা (Pseudo-monus) প্রধান। এসব জীবাণু শাকসবজির জীবন্ত বা মৃত উভয় ধরনের কোষ কলাকে আক্রমন করতে পারে। গোল আলুর চিপস, চালকুমড়ার মোরব্বা, গাজরের হালুয়া, টমেটোর সস, বেগুনের টক, মিষ্টি পটল ইত্যাদির অসংখ্য মজাদার খাবার আমাদের দেশীও শাকসবজি থেকে তৈরি হয়। বিষমুক্ত এবং নিরাপদ খাদ্যের জন্য আমাদেরকে ফসল উৎপাদন থেকে শুরুকরে সংরক্ষন পর্যন্ত সফলতা অবলম্বন করতে হবে। অতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার এবং ওষুধ ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকর যেমন বিষাক্ত হতে পারে তেমনি উৎপাদিত ফসলেও বিষ থাকতে পারে। আমাদেরকে উৎপাদিত শস্য, ফলমূল ও শাকসবজি উৎপাদন, সংরক্ষন ও প্রক্রিয়াজাত করণের সময় রোগ জীবাণু, পোকা মাকড়ের হাত থেকে বাচার জন্য যে মসস্ত ওষুধ ব্যবহার করা হয় তা সবগুলোই বিষাক্ত। এর আক্রমনের ফলে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাছাড়া বিষযুক্ত খাবার খেলে বিভিন্ন রোগ, ব্যাধি এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই আমরা বিষমুক্ত ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য চাই যা একটি সুস্থ্য ও সবল জাতি তৈরি হতে পারে। আমরা তার জন্য (I P M) পদ্বতি ব্যবহার করতে পারি। তার জন্য দরকার সচেতনতা ও উপযুক্ত শিক্ষা।

প্রবন্ধকার : প্রভাষক দর্শন বিভাগ, ইস্পাহানী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রামেরকান্দা, রোহিতপুর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

মহাসাগরে বোতলের মাধ্যমে বার্তা পাঠানোর রোমাঞ্চকর ইতিহাস

নিশাত বেগম

আপনার যা মনে হতে পারে, বোতলের মাধ্যমে বার্তা পাঠানোর ইতিহাস তার চেয়েও বেশি পুরানো। প্রাচীনতম রেকর্ডটি ৩১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। এই পদ্ধতিটি তখন বৈজ্ঞানিক কারণে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই ধারণা হতে বর্তমানের বোতলগুলিতে ব্যবহৃত নস্টালজিক এবং রোমান্টিক বার্তাগুলির ধারণায় আসতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে।

ছবি: The history of messages in bottles is longer than you might think. (936 ABC Hobart: Jo Spargo)

গ্রিক দার্শনিকের বিজ্ঞান গবেষণা

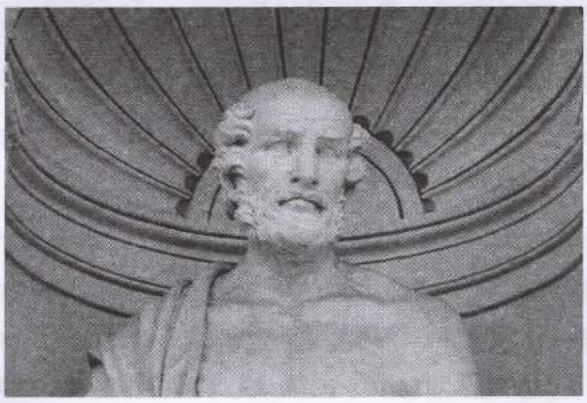

ছবি: Greek philosopher Theophrastus is believed to have put the bottles into the sea as part of an experiment. (Wikimedia)

প্রাচীনতম রেকর্ডকৃত চিঠিটি প্রায় ৩১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের,একটি গ্রীক দার্শনিকের, যার নাম থিওফ্রাস্টাস (Theophrastus)। বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, তিনি একটি পরীক্ষার অংশ হিসাবে সমুদ্রের মধ্যে বোতল নিক্ষেপ করেন। পরীক্ষাটি ছিল আটলান্টিক মহাসাগর থেকে জল প্রবাহ দ্বারা ভূমধ্যসাগর গঠিত হয় কিনা তা খুঁজে বের করা। সমুদ্রে অসংখ্য বোতল নিক্ষেপ সত্ত্বেও, থিওফ্রাস্টাসের পক্ষ হতে, এর কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়ার প্রমান পাওয়া যায়নি।

অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল সামুদ্রিক যাদুঘরের পরিচালক, স্টিফেন গ্যাপস (Stephen Gapps) বলেছেন যে, "আমার মনে হয়, বেশিরভাগ লোকেরা যখন বোতল-বার্তাগুলি সম্পর্কে চিন্তা করবে, তারা হয়ত ভাববে এটি একটি কটু অথবা কাঁটার মত বেঁধে বা খোঁচা দেয় (poignant) এমন নস্টালজিক বার্তা অথবা প্রিয়জনের একটি বার্তা হিসাবে প্রথম ব্যবহৃত হত, বা এমন একটি মজার জিনিস হিসাবে যা দেখতে হবে তা কতদূর যেতে পারে তা দেখার জন্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, এই বার্তাগুলি বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।"

কলম্বাসের 'নিউ ওয়ার্ল্ড' এর খবর পাঠানো

ছবি: Christopher Columbus wrote up a short report of his discovery on a piece of parchment. (Max Rossi : Reuters)

১৪৯০ এর দশকে ক্রিস্টোফার কলম্বাস (Christopher Columbus) 'নতুন বিশ্ব' (the New World) আবিষ্কারের পর আমেরিকা থেকে ফিরে আসার সময় ঝড়ের কবলে পড়েন। তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে কাউকে বলতে সক্ষম হবেন না, এই ভয়ে তিঁনি একটি চর্মের টুকরোতে ছোট্ট প্রতিবেদন লিখেছিলেন এবং একটি বড কাঠের ব্যারেলে পুরে তা সমুদ্রে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এই নোটটি কিং ফার্দিনান্দ এবং রানী ইসাবেলা (King Ferdinand and Queen Isabella)-কে পাঠানোর অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু এইভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

মহাসাগর বোতল খোলনকারি (The Uncorker)

ছবি: Queen Elizabeth I is reported to have created the official position of Uncorker of Ocean Bottles in the 1580s. (Supplied: British Royal Family)

এটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে যে, ১৫৮০ এর দশকে রানী এলিজাবেথ ১, মহাসাগর বোতলগুলির খোলনকারির (The Uncorker) সরকারী অবস্থান (the official position) তৈরি করেছিলেন। তিঁনি স্পষ্টতই বিশ্বাস করেছিলেন যে, কিছু বোতলগুলিতে গুপ্তচর বৃত্তির উদ্দেশ্যে থেকে গোপন যোগাযোগের তথ্য থাকতে পারে এবং অন্য কারো পক্ষে বোতলগুলি খুলা একটি অপরাধ হতে পারে। যারা এই আদেশ অস্বীকার করেছিল তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু, এটি সম্ভবত একটি জনশ্রুতি, গবেষকরা গল্পটি খুঁজে পেতে অক্ষম ছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না লেখক ভিক্টর হুগো এটি তার উপন্যাসগুলির একটিতে লিখেছিলেন।

সংবাদপত্রের খবর 'কবর থেকে বার্তা'

ছবি: One message in a bottle that was found in 1913 is believed to have come from a passenger onboard the Titanic. (ABC News: David Spicer)

টাইটানিকের ডুবে যাওয়ার পর, জীবিতদের কাছ থেকে নোটের সাথে পাওয়া বোতল-বার্তাগুলির অনেকগুলি প্রতিবেদন বের হয়েছিল। ১৯২১ সালের অক্টোবরে আইসল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে একটি বোতল পাওয়া গিয়েছিল। যার মধ্যে একটি বার্তা ছিল: "আমি তাদের মধ্যে একজন, যারা টাইটানিক- হ্যারি উইলসনকে ধ্বংস করে ফেলেছিল।" তবে, টাইটানিক যাত্রী বা ক্রু তালিকায় হ্যারি উইলসনের কোন রেকর্ড ছিল না, সম্ভবত এটি একটি জাল তথ্য ছিল। তারপরেও, টাইটানিকের আরেকটি বোতলে একটি বার্তা পাওয়া গিয়েছিল, যাতে লেখা ছিল, যিরমিয় বার্কের লেখা, ১৯ (penned by Jeremiah Burke, 19)। তাঁর লেখা নোটের অর্থ দাঁড়ায়, "টাইটানিক থেকে, বিদায় সব, গ্লানিমিরে বার্ক, কর্ক" (From Titanic, goodbye all, Burke of Glanmire, Cork)। এটি প্রায় এক শতাব্দীর জন্য বার্ক পরিবারের সাথে ছিল, পরর্তীতে ১৯১৩ সালে ডুঙ্কেটলের তীরে (ashore in Dunkettle)-র স্রোতের সাথে ধুয়ে যায়, যা তার পরিবারের বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। চিঠিটির বাস্তবতা আছে এবং এখন এটি কোভ হেরিটেজ সেন্টারের টাইটানিক প্রদর্শনীর (the Titanic exhibition in the Cobh Heritage Centre) একটি অংশ হিসাবে প্রদর্শিত হচ্ছে।

ফ্লাইং ডাচম্যানের অনেকগুলি রিপোর্ট

১৯২৯ সালে, একটি জার্মান সামুদ্রিক বিজ্ঞানের অভিযান (German marine science expedition), একটি বোতলে একটি বার্তা চালু করে তার নামকরণ করে- ডাক নাম দেয়, 'দ্য ফ্লাইং ডাচম্যান' (The Flying Dutchman)। এতে অনুসন্ধানকারীদের জন্য, বোতল না ভেঙে পড়তে পারা যায় এমন নির্দেশাবলী ছিল। বোতল পাওয়া ব্যক্তিদের রিপোর্ট করতে বলা হয়- কোথায় বোতলটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, এবং তারপর সমুদ্রে ফিরে বোতলটি পুনরায় স্থাপন করতে বলা হয়। বছর ধরে এটি খুঁজে পাওয়ার অনেক রিপোর্ট ছিল। অবশেষে, ১৯৩৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে ধুয়ে ফেলা পর্যন্ত।

ওয়শেড আপ এ (In Washed Up): ফ্লটসাম এবং জেটসামের কৌতুহলী জার্নি (The Curious Journeys of Flotsam and Jetsam) তে, স্কাই মুডি (Skye Moody) লিখেছেন যে, অনুসন্ধানকারীর প্রতিবেদনগুলির উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়েছে যে, একটি বোতল (দ্য ফ্লাইং ডাচম্যান) প্রায় ছয় বছর ধরে ২৫,০০০ কিলোমিটার পথ পরিভ্রমণ করেছে।

সূত্র : https://www.abc.net.au/news/

প্রবন্ধকার : কিউরেটর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রদর্শনীবস্তুসমূহ সাজানো হয়েছে
- বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন আবশ্যক
- আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শনে সকল শিক্ষার্থীদের ফ্রি টিকেট প্রদান করা হবে। ঢাকা মহানগর ও নিকটবর্তী জেলাসূমহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে আনা নেওয়ার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা হবে
- শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো

▶ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শনের সময়সূচি

- রবিবার থেকে বুধবার সকাল ৯:০০ থেকে বিকাল ৫:০০
  শনিবার সকাল ৯:০০ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০
  শুক্রবার দুপুর ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭:০০
  বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

▶ নিম্নোক্ত বিশেষ দিবসসমূহে জাদুঘরের গ্যালারি খোলা থাকে

- মহান স্বাধীনতা দিবস, ২৬ মার্চ
- বাংলা নববর্ষ, ১লা বৈশাখ
- মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর
- জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ

জাদুঘরে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশ দেখার ব্যবস্থা রয়েছে

(শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যার পর ১ ঘন্টা, আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে)

এখানে স্বল্প দৈর্ঘ্য 4D movie প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

www.nmst.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৯১১২০৮৪, ৮১৮১৩২৮